ধূমকেতুর কথা
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

ধূমকেতুর কথা

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

বিড়লা প্লানেটারিয়াম

কলিকাতা

প্রকাশক :
সুধীরকুমার মণ্ডল
মণ্ডল এণ্ড সন্স
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬

মূল্য : কুড়ি টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

মুদ্রাকর :
মৃণালকান্তি ঘোষ
নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০/১বি, অবিনাশ ঘোষ লেন
কলিকাতা—৭০০ ০০৬

—উৎসর্গ—

বইখানা বন্ধুবর শ্রীঅশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই লেখা সম্ভব হয়েছে। বই লেখার একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি আমার কাজে উৎসাহ দিয়েছেন এবং আমায় সাহায্যও করেছেন। সেসব কথা আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি। তা না করলে ঘোরতর অন্যায় করা হয়। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমি তাঁর কাছে ঋণী। আমৃত্যু তাঁর ভালটাই যেন ভাবতে পারি।

আমি সামান্য ব্যক্তি। এই বইখানা সম্বন্ধেও আমার কোন দাবী-দাওয়া নেই। তথাপি এই সামান্য বইখানা অশোকের হাতে তুলে দিলাম। আনন্দচিত্তে অশোক কি তা গ্রহণ করবেন ?

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

ভূমিকা

বহুদিন থেকেই ইচ্ছে ছিল ধূমকেতু নিয়ে কিছু লিখি। কিন্তু বরাবরই পিছিয়ে গিয়েছি। ভেবেছি যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে পড়লে কাজটা আরও ভাল হবে। কিন্তু মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতার অন্ত নেই। লিখতে পারি অথবা নাই পারি লেখার ইচ্ছা যেমন অনেকেরই হয়, এই দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে অবশেষে আমিও দেখছি বইটা লিখে ফেলেছি। এখন বইয়ের গুণাগুণ বিচারের ভার সকল পাঠকের।

আমি সামান্য যে চেষ্টা করে গেলাম, আমার মধ্যে যেসব ফাঁক থাকবে, আন্তরিক অনুরোধ রইল ভবিষ্যতে আপনাদের মধ্যে কেউ না কেউ যেন ধূমকেতু নিয়ে বিস্তৃতভাবে লেখার ব্যাপারে কলম ধরেন, আমার ফাঁকগুলো ভরিয়ে দেন। কেন না ধূমকেতু নিয়ে এখনও প্রচুর বলার অবকাশ আছে।

বাংলায় ভাল বিজ্ঞানসাহিত্য গড়ে তোলার দিন এসেছে। বিজ্ঞানকে অনেকেই আমরা ভালবাসি, কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়, বিজ্ঞানের মর্মমূলে আমরা যেন পৌঁছতে পারি। আমরা যেন ভুলে না যাই বিজ্ঞান আমাদের সমাজভাবনারই একটা অঙ্গ।

বইটির প্রকাশনার জন্য আমি মণ্ডল এণ্ড সন্সের কাছে কৃতজ্ঞ।

অন্যান্যদের কাছ থেকেও আমি যথেষ্ট উৎসাহ এবং সহযোগিতা পেয়েছি। এঁরা হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই শ্রীযামিনীমোহন কর (আশুতোষ কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান গণিতাধ্যাপক), বন্ধু ডঃ সমীর মুখোপাধ্যায় (পুরাতত্ত্ব বিভাগ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), বন্ধু ডঃ তপন চট্টোপাধ্যায় (মহেশ ল্যাবরেটরীজ), বন্ধু শ্রীবিশ্বনাথ সরকার (বর্দ্ধমান নিবাসী), বন্ধু ডঃ অমিত চক্রবর্তী (আকাশবাণী, কলকাতা), ছাত্র শ্রীমান পার্থ চক্রবর্তী (বর্তমানে কানাডা প্রবাসী)। পুত্র শ্রীমান রাজীব স্কেচগুলো এঁকে দিয়েছে।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

হ্যালি

নিউটন

গ্যালিলিও

১৯১০ সালে দেখা হ্যালির ধূমকেতু

হ্যালির ধূমকেতু

১

প্রাক্‌-কথা

ধূমকেতু বড় বিচিত্র জ্যোতিষ্ক!

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে ধূমকেতুকে আমরা দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় সৃষ্টিছাড়া কোন কিছু বলতে চাইছি। আসলে আমাদের পরিচিত আকাশের আর পাঁচটা জ্যোতিষ্কের সঙ্গে ধূমকেতুর কোন মিলই আমরা খুঁজে পাই না বলে ধূমকেতুকে আমাদের এত অদ্ভুত, এত খাপছাড়া মনে হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে বেশ বুঝতে পারা যায় প্রত্যেক জ্যোতিষ্কই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়মশৃঙ্খলার অধীন। পরস্পরের মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা নিগূঢ় সম্বন্ধও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সেই হিসেবে ধূমকেতুকেও ব্যতিক্রম বলে মনে হবে না। তবে আকাশের সব জ্যোতিষ্কই জাতে যেমন এক নয়, ওদের মধ্যেও যেমন আলাদা আলাদা স্বাতন্ত্র্য আছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে শুধু এইটুকু বলা চলে জ্যোতিষ্ক হিসেবে ধূমকেতুর স্বাতন্ত্র্য যেন বড় বেশী প্রকট বলে মনে হয়।

সে যাই হক, ধূমকেতুকে আমরা বিচিত্র জ্যোতিষ্কই বলি আর যাই বলি, তার সৃষ্টিরহস্য, তার বিবর্তনের ইতিহাস, তার গঠনপদ্ধতি, তার কাজের ধারা, এ সব কিছুই আমরা বিজ্ঞানের জ্ঞানের মাধ্যমে জানতে পারি। বিজ্ঞানের আলোকে ধূমকেতুর বস্তুবিচার করতে বসে ধূমকেতুকে আমরা যেভাবে চোখে দেখি সেই কথাটাই এখন একটু বলা যাক।

আমরা একটা উদাহরণে আসতে পারি। রাতের আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র আর দিনের আকাশে সূর্যকে আমরা নিত্যনৈমিত্তিক দেখি। কিন্তু ধূমকেতু? তাকে তো এমনভাবে দেখি না। কত আয়াস,

কত প্রতীক্ষায় দিন কেটে যায়, বরাতগুণে একদিন হয়তো কোন এক ধূমকেতু হঠাৎই আমাদের নজরে পড়ে যাবে। তায় আবার বেশী দিনও ওরা আকাশে থাকে না। অল্প কিছু দিন মাত্র আকাশে দেখা দিয়েই উধাও হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার আছে। সেটা হল অদ্ভুতভাবে ওদের ছোট-বড় হওয়ার কাণ্ডকারখানা। এইভাবে কালেভদ্রে সময় মেপে এবং অদ্ভুত রূপে ধূমকেতুকে আকাশে দেখতে হয় বলেই ওরা আমাদের চোখে এত খাপছাড়া ঠেকে। সন্দেহ নেই সাধারণ মানুষের কাছে এটা হল খুব বড় ধরনের একটা চমক। এখানেই অন্য জ্যোতিষ্কদের সঙ্গে ধূমকেতুর বিরাট পার্থক্য।

এর কারণও অনেক আছে। সেগুলোই আমরা বলব।

প্রথম কথাটাই হল গ্রহ-উপগ্রহ কিংবা নক্ষত্রের কথা আমরা যখন ভাবি তখন এটা আমরা সকলেই বুঝতে পারি যে ওরা হল এক-একটা নিটোল তৈরী জ্যোতিষ্ক। অর্থাৎ ওদের আজ আমরা একভাবে দেখলাম, কাল আর এক ভাবে দেখব, তা কখনও হয় না। হাজার হাজার বছর ধরে ওদের আমরা একই ভাবে আকাশে দেখে আসছি। বিবর্তনগত যে-পরিবর্তনটা আজও ওদের মধ্যে চলেছে সেটা হল অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বাইরে থেকে চোখে পড়বার উপায় নেই। কিন্তু ধূমকেতুর কথায় বলা চলে ওরা সত্যিই যেন বহুরূপী। অর্থাৎ ওরা আদিম রূপে একভাবে তৈরী হয়ে আছে, কিন্তু বাড়তি দেহসৃষ্টি নিয়ে নতুন করে অন্য রূপেও দেখা দিতে পারে। এখানেই ধূমকেতু জ্যোতিষ্কদের মধ্যে স্বতন্ত্র বিবেচিত হতে বাধ্য।

ধূমকেতুর এই স্বাতন্ত্র্য বোঝার জন্য ধূমকেতু তার আদিম দেহ নিয়ে যেভাবে তৈরী হয়ে আছে তার কারণটাও আমাদের যেমন একটু ভেবে দেখতে হবে, সেই সঙ্গে কেনই বা তার বাড়তি দেহ অর্থাৎ লেজের মতন অংশটা গড়ে ওঠে সে বিষয়েও চিন্তা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনাকে পাঁচ ধরণের প্রধান প্রশ্নের আওতায় আমরা নিয়ে আসতে পারি। যেমন,

(১) ধূমকেতু তার কী ধরণের দৈহিক আকৃতি নিয়ে তৈরী হয়ে আছে।

(২) ধূমকেতু কোথায় এবং কেমনভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

(৩) ধূমকেতুর সৃষ্টির উৎস কোথায়।

(৪) কী ধরণের পরিস্থিতিতে ধূমকেতুসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

(৫) ধূমকেতুর পরিভ্রমণের পথ কেমন।

প্রথম কথায় আসা যাক। আমাদের পরিচিত যে সমস্ত তৈরী এবং অখণ্ড জ্যোতিষ্ককে আমরা জানি, যেমন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র। বলার অপেক্ষা রাখে না ওরা হল গোলাকার বা spherical bodies। ধূমকেতু যেভাবে তার দেহ গড়ে তুলেছে তার আকৃতিও আমরা গোলাকারই বলতে পারি। তবে এর কিছু বিশেষত্ব আছে। সেসব কথা আমরা পরে বিবৃত করব। ধূমকেতুর এই দৈহিক অংশটার নাম দেওয়া হয়েছে তার মাথার ভাগ বা head। এই হল ধূমকেতুর আদি রূপ। এই অস্তিত্বেই ছোট-বড় নানান আকারে ধূমকেতু কোন্ আদি কাল থেকে আকাশে বহাল রয়েছে।

কিন্তু কোথায় এবং কীভাবে ধূমকেতু সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে এ প্রশ্ন যখন উঠবে তখন আমাদের মনে রাখতে হবে ধূমকেতুর আদিম মাথার অংশটা আপনাআপনি কখনও কার্যক্ষম হয়ে উঠতে পারে না। এমন কি ধূমকেতুর আদি আস্তানাতেও ধূমকেতুর অতিরিক্ত দেহনির্মাণ অর্থাৎ যাকে আমরা ধূমকেতুর লেজ গজানোর ব্যাপার বলি সে কাজটাও সম্ভবপর নয়। ধূমকেতুর এই লেজ তৈরী হয় অন্য জায়গায়, একটা নক্ষত্রের নিবিড় আওতার মধ্যে এবং বলা বাহুল্য সেই নক্ষত্রের দ্বারাই। আমরা জানি একটা নক্ষত্র হিসেবে সূর্যের কাছে ধূমকেতুর মাথার অংশটা এসে হাজির হলেই তার লেজের অংশটা গড়ে ওঠে। কিন্তু আকাশের অন্য কোন নক্ষত্র ধূমকেতুর বাড়তি দেহ তৈরী করছে কি না এ খবর কেউই আমরা জানি না। তবে আমাদের অনুমান এটা হওয়া সম্ভবপর। আসলে আমাদের পৃথিবী সূর্য থেকে এমন

কিছু দূরে নেই, মাত্র ন'কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল তার দূরত্ব। কিন্তু সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবী যদি আরও অস্বাভাবিক দূরত্বে থাকত তাহলে ধূমকেতুর অতিরিক্ত দেহনির্মাণের কাণ্ডকারখানা আমাদের ভাগ্যে কখনই দেখা হয়ে উঠত না।

এখন কথা হল ধূমকেতুর আদিম মাথার অংশটা যেখানে তৈরী হয়ে আছে সৃষ্টির সেই উৎসটা কোথায়? এ প্রশ্ন খুবই বিতর্কমূলক। প্রচলিত ধারণাটা হল সূর্য থেকে প্লুটো যত দূরে অবস্থিত, প্লুটো থেকে আবার দ্বিগুণ তিনগুণ বা তারও বেশী দূরে এমন একটা পরিমণ্ডলের কথা বিজ্ঞানীরা ভেবে নিয়েছেন যে তার নাম দেওয়া হয়েছে Comet Cloud। তবে মেঘ বলতে আমরা যা বুঝি সেসব কিছু নয়। আমরা শুধু একটা অঞ্চলের কথা ভাবব, সেখানে ঝাঁক বেঁধে অগণিত ধূমকেতু তার মাথার অংশগুলো নিয়ে জমা হয়ে আছে। এখান থেকেই মাঝেমধ্যে ওরা বাস্তুচ্যুত হয়ে সূর্যের প্রবল টানে বন্দী হয়। এবং সূর্যের চারপাশে ঘুরতে থাকে। আমাদের পক্ষে তখন ওদের দেখা সম্ভব হয়। কিন্তু এক দল বিজ্ঞানীর মতে ধূমকেতু কেবল সৌর-মণ্ডলেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে একথাও ঠিক নয়। তাঁরা সামগ্রিক-ভাবেই আমাদের নক্ষত্রজগৎ বা galaxy-র কথাই ভাবছেন। এঁরা বলতে চান ধূমকেতু আমাদের নক্ষত্রজগতের যে-কোনও জায়গাতেই তৈরী হয়ে থাকতে পারে।

এর পর হল ধূমকেতুর সৃষ্টিরহস্যের কথা। রহস্য বলতে এখানে আমরা সৃষ্টির অলৌকিকতা কোন কিছু বোঝাতে চাইছি না। আমাদের বলার উদ্দেশ্য হল ধূমকেতুর সৃষ্টি সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত আমরা যা জানি তা এত অপর্যাপ্ত এবং শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা যেসব মতবাদ তুলে ধরেছেন তার মধ্যে কিছু পরস্পরবিরোধী বক্তব্য জমে থাকার ফলে ধূমকেতু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও সুসংবদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। এরকম হওয়ার পিছনে মনে হয় দু-রকমের মুখ্য কারণ বর্তমান। এক হল ধূমকেতুর অদ্ভুত গঠন-বৈচিত্র এবং কাজের প্রক্রিয়া, আর দ্বিতীয়টা হল Comet Cloud যে-জায়গাটায় গড়ে

উঠেছে সেখানকার কাজকর্মের রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান বড় সীমিত। কেউ কেউ বলছেন সৌর-নীহারিকা থেকে একদা মালমশলা নিয়ে গ্রহ-উপগ্রহগুলোর যেভাবে উদ্ভব হয়েছিল ধূমকেতুরও সেভাবে উৎপত্তি হয়েছে, তবে Comet Cloud সূর্য থেকে এত দূরে রয়েছে যে নানান কার্যকারণের জন্য ধূমকেতুর পক্ষে এক-একটা গ্রহে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়নি। এর বিরুদ্ধে কেউ কেউ বলেছেন বৃহস্পতি এবং শনির অঞ্চল থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সৌরমণ্ডলের একেবারে প্রত্যন্ত সীমানায় ধূমকেতুগুলো জড়ো হয়ে আছে। এর কারণ নাকি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। অগ্ন্যুৎপাতের মালমশলা বৃহস্পতি-শনি এই সব গ্রহদের এলাকা থেকে ছিটকে গিয়ে পড়েছে Comet Cloud অঞ্চলে। সেইখানেই জমাট বেঁধে ধূমকেতু গড়ে উঠেছে। কিন্তু কোন কোন বিজ্ঞানীর এমনও মত যে ধূমকেতু আন্তর্নাক্ষত্র পরিমণ্ডল থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে নিজেদের গড়ে তুলেছে।

তারপর আসে ধূমকেতুর পরিক্রমণের কথা। আমরা জানি গ্রহেরা সূর্যের চারদিকে অনেকটা বৃত্তের মতন পথে ঘোরে। ধূমকেতুর কক্ষপথ কিন্তু সে রকম নয়। এরা ঘোরে উপবৃত্তাকার পথে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পথ ভয়ানক লম্বাটে ধরণের। তারপর গ্রহেরা ঘোরে পশ্চিম থেকে পূর্বে এবং এদের কক্ষতল পৃথিবীর কক্ষতলের সঙ্গে এমন কিছু বড় রকমের পার্থক্যও তুলে ধরেনা। কিন্তু ধূমকেতুর বিশেষত্ব হল গ্রহদের মতন এই ধরনের নিয়মকানুন তারা মানে না।

ধূমকেতু নিয়ে আমাদের এই ধরণের কৌতূহল, প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আরও কিছু আনুষঙ্গিক বিতর্ক উঠবে। যেমন, গ্রহ-নক্ষত্র ওরা হাজার-হাজার বছরের অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে আকাশে আছে এবং থাকবে। কে কবে নষ্ট হয়ে যাবে একথা বলা কোনও দিনই সম্ভব নয়। কিন্তু ধূমকেতু এমন এক জ্যোতিষ্ক যে যারা বার বার করেই সূর্য-পরিক্রমা করে তাদের আয়ু সীমিত হতে বাধ্য, তারা

একদিন ধ্বংস হয়ে যাবেই। তারপর ধরা যাক তুষার-যুগের কথা। ধূমকেতুর প্রভাবেই কি তুষারযুগ পৃথিবীতে নেমে আসত এবং প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের অবলুপ্তি ঘটত ? আবার, ধূমকেতুর দ্বারা পৃথিবীতে নানারকম রোগ-মড়কও নাকি ছড়িয়ে পড়তে পারে, আবহাওয়ারও প্রচণ্ড হেরফের ঘটতে পারে ? এগুলো যেমন প্রশ্ন, এই সঙ্গে ধূমকেতুর সঙ্গে আর অন্য কোন জ্যোতিষ্কীয় পদার্থের মিল আছে কি না সেটাও ভেবে দেখা দরকার।

হালআমলে ভীষণ চাঞ্চল্যকর একটা দাবী উঠেছে। এ প্রসঙ্গের বিশেষ একটা গুরুত্ব আছে বলে আমরা মনে করি। পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টির ব্যাপারে যেসব উপাদান পাওয়া গিয়েছে এবং যেভাবে প্রাণের বিকাশ ঘটেছে এর পিছনে নাকি বহির্জগতের কোন হাত আছে অর্থাৎ ধূমকেতুই নাকি পৃথিবীতে জীবনসৃষ্টির মালমশলা একদিন বয়ে নিয়ে এসেছিল ? এর পিছনে যুক্তি কতটা ? ভেবে দেখতে হবে।

ধূমকেতু নিয়ে বাস্তবিক আমাদের কত বিস্ময়, কত অনুসন্ধিৎসা যে জমা হয়ে আছে তা বলে শেষ করা যায় না। প্রাক্-কথায় এই সম্বন্ধে মোটামুটি আমরা একটা কাঠামো তৈরী করে রাখলাম। এই সূত্র ধরেই বিজ্ঞানের আলোকে ধূমকেতু নিয়ে আমাদের আলোচনাকে আমরা তুলে ধরব।

২

ধূমকেতু সম্বন্ধে আমাদের বিকৃত ধারণা

বিজ্ঞানীর কাজই হল, বিজ্ঞানের জ্ঞানকে প্রয়োগ করে বস্তুজগতের যথাযথ প্রকৃতি বোঝার তিনি চেষ্টা করেন। কিন্তু বিজ্ঞানের জ্ঞান যাঁদের কাছে পরিষ্কার নয়, তাঁরা শুধু নিজের মনগড়া কিছু ধারণা নিয়েই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি বিচার করতে বসেন। এই ধরণের মানসিকতা আজকের দিনে যে গড়ে উঠেছে তা নয়, আবহমান কাল ধরেই এ জিনিস চলেছে, সত্যি কথা বলতে কি আদিম মানুষের কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে এ জিনিস আমরা পেয়েছি। এককালে মানুষ যখন প্রকৃতির কোলে বাস করতেন তখন প্রকৃতির সঙ্গে আত্মস্থ হওয়ার চেয়ে প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ভয়ভাবনা, অজ্ঞতাই বেশী ছিল। আকাশ আর পৃথিবী চিরকালই মানুষকে ভাবিয়েছে। পৃথিবী এবং আকাশকে কেন্দ্র করে যেসব ঘটনাগুলো ঘটত, যেমন, ঝঞ্ঝা-বজ্রপাত-শিলাবৃষ্টি-বন্যা-উল্কাপাত-সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ এ সব কিছুই যে একটা ভৌত নিয়মশৃঙ্খলার অধীন, কার্যকারণসম্বন্ধযুক্ত প্রাচীনকালে এ বিষয়ে কোন জ্ঞানই আমাদের গড়ে ওঠেনি। আমরা তখন ভাবতাম এ সব ভেলকির খেলার মতন ঘটে যাচ্ছে এবং আড়ালে কেউ রয়েছে, তারই অঙ্গুলি হেলনে এই সব কাণ্ডকারখানা ঘটছে। এইভাবেই প্রকৃতিকে আমরা জীবন্ত, ভয়ানক শক্তিশালী, প্রমত্ত এবং স্বাধীন মনে করে নিয়েছিলাম। অপার বিস্ময়ে এবং সংশয়ের সূত্র ধরেই একদিন রহস্যময়তার জন্ম হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ধূমকেতুকে আমাদের দেখতে হয়েছিল এবং তার কথা ভাবতে হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে ধূমকেতু সম্বন্ধে আমাদের বহু অলৌকিকচিন্তা, অর্থহীন উক্তি, উদ্ভট, আজগুবি ধারণা দানা বেঁধে উঠেছিল। কিন্তু আদিম যুগ পিছনে ফেলে আমরা যখন এগিয়েও গিয়েছিলাম, সভ্য হয়েছিলাম, অনেক

সুন্দর সাংস্কৃতিক চেতনারও উন্মেষ হয়েছিল, তখনও যে আমরা সংস্কারগ্রস্ত মনোভাবকে ত্যাগ করতে পেরেছিলাম এমন মনে করলেও ভুল করা হবে। সমাজব্যবস্থা যখন জটিল থেকে জটিলতর এবং ব্যাপক আকার নিয়েছিল তখনও আমরা ঐতিহ্যপুষ্ট গোঁড়ামি এবং স্বার্থবুদ্ধিকে বিসর্জন দিতে পারিনি। মানুষের সরল আদিম দুর্বল মানসিকতাকে সব সময়েই দোহন করা হয়েছে। আজও এর শেষ নেই। যুক্তি আশ্রিত স্বচ্ছ চিন্তার পথে বারে বারেই বাধার প্রাচীর তুলে দেওয়া হয়েছে।

এই পটভূমিতে ধূমকেতুকেও দাঁড় করিয়ে তাকে কেন্দ্র করে যেসব যুক্তিহীন কাহিনী-কিংবদন্তিকে সাহিত্যের পাতায় পল্লবিত-পুষ্পিত করে তোলা হয়েছে তার সম্বন্ধেও আমাদের একটু পরিচয় থাকা দরকার। এর থেকে আমরা ধারণা করতে পারব অপবৈজ্ঞানিক ধারণা কী বিপুল পরিমাণে আমাদের ক্ষতিকারক হতে পারে। কিন্তু উদাহরণ অনেক আছে। অনাবশ্যক উদ্ধৃতি আমরা দেব না। কেবল, কিছু নির্বাচন করে নেওয়া যাক।

প্রথমেই মহাভারতের প্রসঙ্গে আসুন। সেখানে দেখুন ভীষ্মপর্বে বলা হচ্ছে :

ধূমকেতুর্মহাঘোরঃ পুষ্যমাক্রম্য তিষ্ঠতি।
সেনয়োরশিবং ঘোরং করিষ্যতি মহাগ্রহঃ॥

অর্থাৎ কি না পুষ্যা নক্ষত্রের কাছে একটা ধূমকেতু উঠেছে। এর দ্বারা ভয়ানক অমঙ্গলই সূচিত হবে। এতে লোকক্ষয় হবে, ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু ধূমকেতু আকাশে উঠলেই বা আমাদের অমঙ্গল হবে কেন? ধূমকেতু তো একটা জ্যোতিষ্ক, নিছক প্রাকৃতিক নিয়মের কারণেই তাকে আমরা আকাশে দেখি। এও অনেকে বলবেন এসব হল শাস্ত্রকথা, শাস্ত্রের মধ্যে অমন কত গল্পকথাই আছে, সবই কি বিশ্বাসযোগ্য? যাঁরা যুক্তিনির্ভর পথে চলেন, যাঁরা বস্তুবাদী, তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু অসংখ্য মানুষ যাঁদের কাছে শাস্ত্রবাক্য আপ্তকথা তাঁরা এইধরণের কাহিনী পড়ে নিজেরাও যেমন রোমাঞ্চিত

হবেন অপরকেও এই সব কাহিনীগুলো শুনিয়ে তাঁদের উসকানি দেবেন এবং অলৌকিকতায় আস্থা জোরদার করে তুলবেন। এইভাবে অপবৈজ্ঞানিক ধারণা, কুসংস্কার আমাদের মধ্যে কায়েম হয়ে বসে।

শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র, চীন, জাপান, কোরিয়া, ইউরোপ, পারস্য, মেক্সিকো, কোথায় নয়, ধূমকেতুকে কেন্দ্র করে আমরা অশুভ চিন্তা করে গিয়েছি এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছি। অথচ এর পিছনে কোন যুক্তি নেই।

প্রাচীন চীনের সম্রাটরা নৈসর্গিক অনেক কিছু ঘটনার কারণ জানার জন্য তাঁদের রাজদরবারে জ্যোতিষী নিয়োগ করতেন। কিন্তু জ্যোতিষীদের তো আর বিজ্ঞানের জ্ঞান ছিল না, তাঁরা নিজেদের ইচ্ছে মতো নানান রোমাঞ্চকর ব্যাখ্যার অবতারণা করতেন। উল্কাপাত, সূর্যগ্রহণ, ধূমকেতুর আবির্ভাব, এ সব কিছুর পিছনেই তাঁরা কোন না কোন অশুভ শক্তির কাজের ইঙ্গিত খোঁজার চেষ্টা করে গিয়েছেন। কখনও তাঁরা বলেছেন ধূমকেতুর মধ্যে ঐশীশক্তি লুকিয়ে আছে, ধূমকেতু যা খুশী তাই করতে পারে, যেমন, ধূমকেতুর দ্বারা বন্ধ্যা নারীও গর্ভবতী হতে পারেন এবং তাঁদের বিশ্বাসই ছিল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সম্রাট চিন্ শি-হুয়াঙের মা নাকি এইভাবেই একটা ধূমকেতুর আবির্ভাবে গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং তাতেই সম্রাটের জন্ম হয়েছিল[১], আবার কখনও বা এঁরা বলেছেন ঈশ্বরের ক্রোধ থেকেই ধূমকেতুর উদ্ভব. আকাশে ধূমকেতু ওঠার অর্থই হল ধূমকেতুর রূপ নিয়ে ঈশ্বরের ক্রোধ যেন একটা ঝাড়ুর মতন পৃথিবী থেকে পাপীতাপী-সাম্রাজ্য-প্রজা সব কিছু ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিতে চাইছে[২]।

আবার, আগেকার দিনে পারস্য দেশে যাঁরা জরথুস্ট্রের ধর্ম মানতেন তাঁদের ধারণা ছিল ধূমকেতু মহাকাশপ্রকৃতির মূর্তিমান যমদূত। ওঁদের ধর্মে Ahriman হল অশুভ শক্তির প্রতীক। এই ধূমকেতু Ahriman-এর দ্যোতনা করে।[৩] তাঁরা বলতেন ধূমকেতু আকাশে উঠলে রাজপাট সব ওলট-পালট হয়ে যায়, রাজা মরে প্রজা

কাঁদে, বানবন্যায় দেশ ভাসে, মহামারীতে দেশ উজাড় হয়ে যায়। প্রাচীন পারসিক ধর্ম মানেন এমন বহু লোক আজও আছেন। আমাদের এই কলকাতাতেই জরথুস্ট্র ধর্মাবলম্বী বেশ কিছু মানুষ আছেন। জানতে ইচ্ছে হয়েছিল আজকের এই আধুনিক যুগে ধূমকেতু সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাবটা কী? ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম[৪]। ওঁরা শাস্ত্র মানলেও আজ দেখলাম ওঁরা একটু মত পালটিয়েছেন। ধূমকেতুকে ওঁরা মূর্তিমান যমদূত বলতে চাইলেন না। ওঁদের মতে ধূমকেতু অবশ্যই এক জ্যোতিষ্ক। তবে সামগ্রিকভাবে আকাশের কথা চিন্তা করে ওঁরা বলেছিলেন আকাশ এমন একটা অদ্ভুত জায়গা যে এখান থেকে কিছু না কিছু বিপদের সব সময়েই সম্ভাবনা আছে। সেই হিসেবে ধূমকেতু আকাশে উঠলে এঁরা প্রার্থনাসভার আয়োজন করেন, উদ্দেশ্য হল জগতের শান্তি যেন বজায় থাকে।

এদিকে মেক্সিকোর প্রাচীন বিবরণে জানতে পারা যায় সেখানকার মানুষ ধূমকেতুকে অপদেবতা ঠাউরে বসেছিলেন। তবে এ অপদেবতা আবার যা তা নয়, তাকে একটু উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হত। যে-সব সেনাধ্যক্ষ বা রাষ্ট্রনায়ক মারা যেতেন তাঁরাই নাকি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়ে অদ্ভুত একটা ধূমকেতুর রূপ নিয়ে আকাশে উঠতেন।

কী আশ্চর্যের ব্যাপার মেক্সিকোর মতন ইউরোপের মানুষও দীর্ঘ কাল ধরে মনে করে এসেছিলেন যে ধূমকেতু বিখ্যাত মৃত ব্যক্তিদেরই আত্মা। এই ধরনের ধারণা গড়ে তোলার মূলে ছিল অবশ্য দেমোক্রিতাসের মতবাদ। তখনকার দিনে দেমোক্রিতাস (Democritus-খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী) ছিলেন মহা জ্ঞানী এবং দার্শনিক ব্যক্তি। অথচ তাঁর পাণ্ডিত্যের নমুনা দেখুন, ধূমকেতু ধোঁয়াটে ছায়ার মতন দেখতে হয়, এই আছে এই নেই, অতএব তিনি মনে করে বসলেন এ তাহলে নিশ্চয়ই অশরীরী প্রেতাত্মা ছাড়া আর কিছু নয়। দেমোক্রিতাসের কথায় লোকে এত দূর অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর পর বিবরণে প্রকাশ আকাশে নাকি একটা ধূমকেতু উঠত এবং ওটা ছিল সীজারেরই প্রেতাত্মা। সীজারের মৃত্যুর পর

সত্যিই আকাশে ধূমকেতু উঠত কি না এটা তর্কের ব্যাপার। প্রমাণ দেওয়া অত সহজ নয়। এবং ধূমকেতু যে বাস্তবে প্রেতাত্মা হতে পারে না বা প্রেতাত্মা বলে যে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই এটা আমরা বুঝি। কিন্তু লোকে এই ব্যাপারটাকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে এমন এক মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন যে তাতে একটা ধূমকেতুর চিত্র এবং IVLIUS (অর্থাৎ Julius) কথাটা ক্ষোদিত করা ছিল।

আগেকার দিনের পণ্ডিতদের স্বভাবই ছিল নিজের অধীত বিষয় ছাড়াও তাঁরা জ্ঞানের অন্য বিষয়ে নানা রকম মন্তব্য করতেন। এটা ছিল তাঁদের পাণ্ডিত্যের অহমিকা, জ্ঞানেরক্ষেত্রে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের লোভ। "ধূমকেতু নিয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদের (!) কত লেখা আমাদের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ছড়িয়ে আছে তার হিসেব দেওয়া মুশকিল"।[৫] কিন্তু তাঁদের এই অনধিকার চর্চা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিষময় ফল প্রসব করত। সাধারণ মানুষ ভুল পথে চালিত হতেন। এই হিসেবে শুধু দেমোক্রিতাসই আমাদের ক্ষতি করে যাননি, প্লিনির (Pliny-খ্রীষ্টাব্দ ২৩-৭৯) মতন বিখ্যাত ঐতিহাসিকও ধূমকেতু সম্বন্ধে বলে গেলেন ধূমকেতু নক্ষত্র জাতীয় পদার্থ এবং এত ভীতিপ্রদ যে আকাশে উঠলে শুধু রক্তগঙ্গাই বয়ে যায়।[৬]
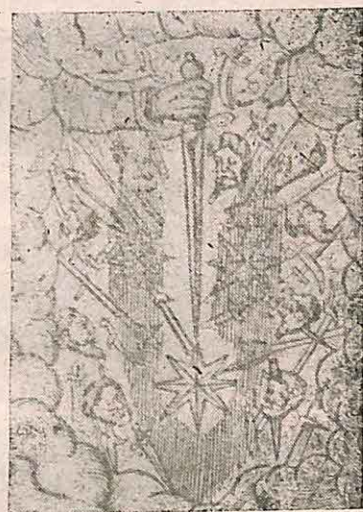
ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসী শল্য-চিকিৎসক—লেখক আঁ ব্রো য়া স পারের (Ambroise Pare') ধূমকেতু সম্বন্ধে ভীতিজনক কল্পনা। হাতে ধরা তরবারিটাকে ধূমকেতু মনে করা হয়েছে। অর্থাৎ বক্তব্য এই ধূমকেতু রক্তপাত ঘটাচ্ছে। তার চারপাশ ঘিরে কাটা মুণ্ড এবং ছোরা-ছুরিই তার নিদর্শন।

এদিকে কুলিকোভার যুদ্ধে (১৩৭৮ সাল) তাতার শক্তি বিধ্বস্ত

হয়ে গেল। আর এমনিই কাকতালীয় ঘটনা সেই বছরই আকাশে একটা ধূমকেতু (হ্যালির ধূমকেতু) উঠেছিল। লোকে অমনি ধূমকেতুকে অভিযুক্ত করল যে তার জন্যই তাতার শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।'

নজিরের শেষ নেই। পোপের মৃত্যু হল, সপ্তম এডওয়ার্ড মারা গেলেন, শিবাজীরও মৃত্যু হল। সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ বললেন এই সব দুর্ঘটনার মূলে ছিল ওই ধূমকেতু। যাঁরা বিজ্ঞানের কারবারী নন,

(১৮৫৭ সালের ধূমকেতু সম্বন্ধে প্রচারিত পুস্তিকার শিরোনামা।)

যাঁরা সাহিত্যস্রষ্টা, বিশুদ্ধ রসসৃষ্টিই যাঁদের কাজ, তাঁরাও পিছিয়ে রইলেন না, ধূমকেতু সম্বন্ধে নানা অবান্তর কথা বলে মানুষ জনকে বিভ্রান্ত করে রাখলেন। আগেকার দিনের মহাকবি কালিদাসও যেমন আছেন, পরবর্তী কালের এডগার এ্যালান পো, এইচ.জি.ওয়েলস, এডগার ওয়ালেস, জুল ভের্ণ, কলিন উইলসনও আছেন। এঁদের লেখা পড়ুন, চিন্তা করুন ধূমকেতু সম্বন্ধে এঁদের যেসব উক্তি আছে তার দ্বারা সমাজের উপকার হবে, না অপকার হচ্ছে।

১৯৩২ সালে কমিন্স বোমোঁ (Comyns beaumont) Mysterious Comet নামে এমন একখানা বই লিখে ফেললেন যে সেখানে পাতার পর পাতা জুড়ে তিনি ভূমিকম্প, ঘূর্নিবাত্যা, আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং সংক্রামক রোগের কারণ হিসেব ধূমকেতূকে দায়ী করে রাখলেন। বুঝুন ব্যাপারখানা। আর ১৯৫০ সালে ইমানুয়েল ভেলিকোভস্কি (Immanuel Velikovsky) লিখলেন Worlds in Collision নামে একখানা বই। তাঁর কল্পনা ছিল আরও সুদূরপ্রসারী। এত মারাত্মক কথাবার্তা তিনি বলে গেলেন! এমন কথা কি কখনও শুনেছেন যে ধূমকেতু থেকে শুক্রগ্রহের উৎপত্তি হয়েছে? বিশ্বাস কি করবেন পৃথিবীর মেরুদণ্ডের উপর তার ঘোরার কাজটা ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে একটা ধূমকেতুর দ্বারাই বেমালুম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং সেই সময় লোহিত সাগরের জল দু-পাশে সরে গিয়ে ইজরাইল উদ্বাস্তুদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছিল? ভবিষ্যতেও কি কোন ধূমকেতু পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মহাকাশ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে?

কিন্তু সুখের কথা যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ এই ধরনের বিজ্ঞানের পরিপন্থী অপচেষ্টাকে মেনে নিতে পারেন নি। চতুর্দিকে প্রতিবাদের এত প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল যে মূল প্রকাশককে বাধ্য হয়ে বাজার থেকে সমস্ত বই তুলে নিতে হয়েছিল। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। তখন অসাধু প্রকাশক গোপনে কাজে নেমেছিলেন। বেনামে বইখানা এত বিক্রি হতে লাগল যে ১৯৭২ সালে দেখা গেল বইখানার ১৫শ সংস্করণ হয়ে গিয়েছে।

এই সব যাবতীয় কুসংস্কার এবং স্বার্থসিদ্ধি থেকে আমাদের মুক্তি দরকার। বিজ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে অবশ্যই আমাদের কেতবী আলোচনা করতে হবে। কিন্তু এটাই সব নয়। আমাদের বুঝে নিতে হবে আদিম কালের অজ্ঞতাকে মুলধন করে আজও পর্যন্ত যেভাবে অভিজাত সংস্কৃতি আমাদের সমাজের ক্ষতি করে চলেছে তার বিরুদ্ধে আমরা যেন অন্তত প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতে পারি। বিজ্ঞান

হল বাস্তব অভিজ্ঞতানির্ভর বিশেষ একটা মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ প্রত্যেক মানুষের মানসিক বিকাশের সাহায্য করে, তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ জাগিয়ে তোলে। এই জন্যই বিজ্ঞানকে আমাদের ভালবাসতে হবে। ধীরে ধীরে তাহলেই আমাদের স্বচ্ছ বাস্তববোধ গড়ে উঠবে। এই বোধ নিয়ে, এই সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে মানুষজনকে যেন আমরা বোঝাতে পারি যে ধূমকেতু আকাশে উঠলেই ভয়ের কোন কারণ নেই। পুঁথির পাতায় কিংবা লোকশ্রুতিতে ধূমকেতু সম্বন্ধে যেসব অলৌকিক কাহিনীকে ধরে রাখা হয়েছে সেগুলোকে আর যেন আমরা গুরুত্ব না দিই। এবং নতুন করেও এই ধরনের কোন কিছু লেখা বা প্রচারের অপচেষ্টাকে যেন প্রতিরোধ করি।

পাদটীকা

১ দ্রষ্টব্য : The Annals of the Bamboo Books

২ ঐ : Confucianism and its Rivals, M.A. Giles London 1915, page 180

৩ ঐ : Zend Avesta/Sacred Books of the East, Miiller, Vol. xxiii, Clarendon Press, Oxford

৪ Zoroastrian Anjuman Atash Adarau 91, Metcalfe Street, Calcutta 700 013

৫ দ্রষ্টব্য : Himmelskunde fiir Jedermann, Arthur Krause, 1958, W. Keller & Co. Stuttgart

৬ Pliny রচিত Historia Naturalis (Natural History)

৭ পৃথিবী ও আকাশ, Foreign Languages Publishing House, Moscow.

৮ "উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবত্থিতঃ", (ধূমকেতুর উদয়ে মানুষজন সব কিছুই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়), কুমার-সম্ভবম্, ২/৩২

৩
ব্যক্তিগত সমীক্ষায় ধূমকেতু-ভাবনা

পুঁথিপত্রে ধূমকেতু সম্বন্ধে যাই লেখা থাক বা যে-ধরনের লোকশ্রুতিই মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে থাকুক, তথাপি আজকের এই চলতি দিন গুলোয় ধূমকেতু বলতে সর্বস্তরের মানুষ আমরা কে কী বুঝি, ধূমকেতু সম্বন্ধে কে কতটা অলৌকিক চিন্তা করছি, বা কার কতটা সঠিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান গড়ে উঠছে, এটা একবার সরেজমিনে ব্যক্তিগত সমীক্ষা চালিয়ে জানতে বড় ইচ্ছে হয়েছিল। আমার অন্যতম মুখ্য কর্মক্ষেত্র কলকাতার প্লানেটারিয়ামে জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষত মুখোমুখি হয়ে বসার আমাদের একটা সুযোগ আছে। সকলেই জানেন সারা বছর ধরে দেশবিদেশের অসংখ্য মানুষের এখানে গতায়াত চলে। যখনই সুযোগ পেতাম মাঝে মাঝে সরাসরি মানুষজনের কাছে চলে যেতাম এবং ধূমকেতু নিয়ে কিছু প্রশ্ন তাঁদের সামনে তুলে ধরতাম। এইভাবে তাঁদের মনোভাবটা জানার চেষ্টা করেছিলাম। এই ধরনের কাজে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কোন্ অঞ্চলের মানুষ, এসব কোন ভেদাভেদই রাখতাম না। পরীক্ষায় ১৬০ জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। এঁদের মধ্যে বেকারও ছিলেন আবার ধনী ব্যবসায়ীও ছিলেন সাধারণ চাকুরীজীবীর সঙ্গে ছিলেন স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীরা। সেই সঙ্গে বিশেষ পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি, সাধারণ অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি, গৃহিণীও রয়েছেন। অশিক্ষিত, সরল, অতি সাধারণ গ্রাম্য মানুষও যেমন ছিলেন আবার শহরাঞ্চলের দিনরোজগারী কিছু মানুষও ছিলেন। সামান্য কিছু বিদেশীর সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। ধূমকেতু নিয়ে এঁদের কাছে কোন তাত্ত্বিক প্রশ্ন তুলে ধরাটা উচিত মনে করিনি, কেবল সাদামাটা কিছু প্রশ্নেই

আমার জিজ্ঞাসা সীমাবদ্ধ রাখতাম। আশা রাখছি, আপনাদের মতন সকল পাঠকের এই সমীক্ষা উপভোগ্য হবে।

প্রশ্নগুলো ছিল :

(১) চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রের মতন ধূমকেতু বলেও একটা জিনিস আছে, কখনও-সখনও তাকে আকাশে দেখা যায়। এই ধূমকেতু সম্বন্ধে আপনি কী জানেন ?

(২) আপনি কি কখনও ধূমকেতু দেখেছেন, খালি চোখে আকাশে না দেখলেও ছবির মাধ্যমেও কি অন্তত তাকে দেখেছেন ?

(৩) আপনি কি মনে করেন ধূমকেতু আকাশে উঠলে আমাদের কোন অমঙ্গল হতে পারে ? যদি তাই হয় তাহলে এই অশুভ ব্যপার কী ধরণের ঘটতে পারে বলে মনে হয় ?

(৪) ধূমকেতু সমন্ধে বিজ্ঞানের মাধ্যমে ভাল করে আপনার কি কিছু জানার ইচ্ছে হয় ? এই কাজ কীভাবে করবেন বলে মনে করেন ?

সমীক্ষার প্রথম দিকে এই সব প্রশ্ন নিয়ে লোকেদের মাঝে হাজির হতে গিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম প্রথম প্রশ্নেই হোঁচট খাচ্ছি। আলোচনা এগোতেই চাইছে না, ধূমকেতু বলতে কার কথা যে বলতে চাইছি এটাই অনেকে বুঝতে পারছেন না। তখন তাঁদের ধূমকেতুর একটা ছবি দেখতাম এবং সেই ছবি দেখিয়ে আলোচনা শুরু করতাম। এতে প্রশ্ন-উত্তর সহজ হয়ে আসতে লাগল। ১৬০ জনের মধ্যে ধূমকেতু সম্বন্ধে পাকাপোক্ত জ্ঞান না থাকলেও ২৮ জনের ধূমকেতু সম্বন্ধে মোটা-মুটি চলনসই গোছের জ্ঞান ধরা পড়েছিল। অর্থাৎ শতকরা মাত্র ১৭ ভাগ। এঁরা কেউই কখনও চাক্ষুষ ধূমকেতুকে দেখেন নি বটে, কিন্তু ছবির মধ্য দিয়ে ধূমকেতুর আকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিহাল। ধূমকেতু একটা জ্যোতিষ্ক ছাড়া অন্য কিছু নয়, ধূমকেতু সূর্য-পরিক্রমা করে, ধূমকেতুর কক্ষপথ অদ্ভুত ধরণের এবং সেই জন্যই তাকে দীর্ঘ দিন অন্তর অন্তর আকাশে দেখা যায়, সূর্যের প্রভাবেই তার গ্যাসীয় লেজের মতন অংশের সৃষ্টি হয়, এই সব প্রাথমিক কথাগুলোও এঁদের

মুখ থেকে শুনে আনন্দ হয়েছিল। ধূমকেতু সম্বন্ধে এঁরা আরও বিস্তৃতভাবে জানার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এঁরা এমন অভিযোগও করেছিলেন যে ধূমকেতু সম্বন্ধে সহজ জনবোধ্য বইপত্রের বড় অভাব।

দ্বিতীয় প্রশ্নের যে-উত্তর পেয়েছিলাম আমাদের বোঝার সুবিধের জন্য তাকে আমরা দু-ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। আকাশে প্রত্যক্ষত খালি চোখে ধূমকেতু দেখেছেন এমন লোকের সংখ্যা ছিল ১৬০ জনের মধ্যে মাত্র ৩ জন, অর্থাৎ শতকরা প্রায় দু-ভাগের কাছাকাছি। এঁরা তিন জনেই ছিলেন বৃদ্ধ ব্যক্তি। এখনও মনে আছে তিন জনের মধ্যে দু-জন ছিলেন গুজরাত-নিবাসী এবং দুই ভাই। এককালে ব্যবসা করতেন। যে-ধূমকেতুকে এঁরা দেখেছিলেন তার নাম এঁরা করতে পারেন নি, কিন্তু বছরের হিসেব দিয়েছিলেন। ১৯১০ সাল। অর্থাৎ এঁরা দেখেছিলেন হ্যালির ধূমকেতুকে। অন্য জন ছিলেন এলাহাবাদ অঞ্চলের এক পণ্ডিত মানুষ, পেশায় জ্যোতিষী। তবে ইনি বছরের নিখুঁত হিসেব দিতে না পারলেও অনেকটা যে-সময়ের উল্লেখ করেছিলেন বুঝতে পেরেছিলাম সেটা ছিল ১৯১০ সাল অর্থাৎ হ্যালির ধূমকেতু দেখার বছর। যেহেতু ইনি জ্যোতিষী এবং জ্যোতিষী মাত্রেই বিশ্বাস করেন যে আমাদের জীবন জ্যোতিষ্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় অতএব আমাদের জীবনে ধূমকেতুর কোন কুপ্রভাব আছে কি না এটা এঁর কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম। এঁর মতটা ছিল জ্যোতিষশাস্ত্রে ধূমকেতুকে কোন প্রাধান্যই দেওয়া হয়নি এবং সেই হিসেবে তিনি ধূমকেতুকে অমঙ্গলজাতীয় কোন কিছু মনে করেন নি। ছবিতে ধূমকেতু দেখে তার আকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করেছেন এমন লোকের সংখ্যা ছিল ১৬০ জনের মধ্য ৬৫ জন অর্থাৎ প্রায় ৪০ শতাংশ ব্যক্তি। ধূমকেতুর দ্বারা আমাদের কোন অমঙ্গল সৃষ্টি হয় কি না তিন ভাগে এর উত্তর পেয়েছিলাম। ৮৩ জন খোলাখুলিভাবেই মনে করেন যে ধূমকেতুর দ্বারা আমাদের অমঙ্গলজাতীয় কোন কিছু হতে পারে অর্থাৎ এঁরা সংখ্যায় ছিলেন প্রায় ৫২

শতাংশ। কিন্তু ধূমকেতুর দ্বারা আমাদের কী ধরণের অমঙ্গল যে হতে পারে এর সদুত্তরও এঁরা দিতে পারেন নি। আমার মনে হয়েছিল আকাশকে আমরা যেমন অনেকেই একটা দুঃস্বপ্নের জায়গা বলে মনে করি সেই হিসেবে নিশ্চয়ই এঁরা ভেবেছিলেন ধূমকেতুরও তাহলে একটা ক্ষতিকারক, অলৌকিক শক্তি আছে। ১৬০ জনের মধ্যে ২০ জন অর্থাৎ মাত্র প্রায় ১২ শতাংশ ব্যক্তি হলেও এঁরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে ধূমকেতু অমঙ্গলজাতীয় কোন কিছু নয়, ধূমকেতু হল সাধারণ একটা জ্যোতিষ্ক, তার দ্বারা আমাদের ক্ষতির কোন প্রশ্নই ওঠে না। ধূমকেতু কোন অশুভ শক্তির সূচনা করে কি না ৫৭ জন ব্যক্তি এর স্বপক্ষে-বিপক্ষে কোন কথাই বলেন নি। এঁদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই ধূমকেতু যে আসলে কী তাই জানেন না। ছবি দেখেও কোন ধারণা গড়ে তুলতে পারেন নি, এমন কি একটু ব্যাখ্যা শুনেও কিছু বুঝতে পারেন নি। বাদ বাকি যাঁরা নীরব থেকেছিলেন মনে হয় তাঁরা কৌশলে প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছেন। এবং এঁরা সকলেই ছিলেন ভদ্র, শিক্ষিত, অভিজাত এবং ধনী। কথাবার্তায়, আকারে-ইঙ্গিতে মনে হয়েছিল ধূমকেতুর যে একটা অমঙ্গলকারী প্রভাব আছে এটা এঁরা মনে মনে বিলক্ষণই মানেন, কিন্তু বাইরে লোকলজ্জার ভয়ে সরাসরি সেটা স্বীকার করে নিতে চাননি। ১৬০ জনের মধ্যে ৮১ জনের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে এঁরা ধূমকেতু সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত কিছু জানবেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই অভিযোগও করেছিলেন আমাদের দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষার তেমন পরিবেশ নেই এবং বইপত্রও সহজলভ্য নয়।

এখন, বর্তমান সমীক্ষাকে একটা ছকের মাধ্যমে পেশাগত, বিত্তগত এবং শিক্ষাগত ভিত্তিতে আরও একটু বিশ্লেষিত করে সকলের সামনে তুলে ধরলাম। (পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

	শিক্ষিত বেকার	শিক্ষিত/বিশেষ পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি/ধনী ব্যবসায়ী	শিক্ষিত সাধারণ চাকুরে	শিক্ষক-শিক্ষিকা	ছাত্রছাত্রী	সাধারণ মহিলা	সাধারণ মানুষ	বিদেশী	
	১০	১৬	১৮	১৫	২৮	১৮	৪৭	৮	১৬০
প্রশ্ন ১ ধূমকেতু সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান	৫	—	৬	৫	৪	২	—	৬	২৮
প্রশ্ন ২ক যাঁরা সচক্ষে ধূমকেতু দেখেছেন	—	১	—	—	—	—	২	—	৩
প্রশ্ন ২খ যাঁরা ছবির মাধ্যমে ধূমকেতু দেখেছেন	৭	—	১১	১৫	২৪	—	—	৮	৬৫
প্রশ্ন ৩ক ধূমকেতুর দ্বারা আমাদের অমঙ্গল হতে পারে	৩	১০	১০	২	২	১৬	৪০	—	৮৩
প্রশ্ন ৩খ ধূমকেতু অশুভজনক নয়	৭	—	২	৫	—	—	—	৬	২০
প্রশ্ন ৩গ যাঁরা নিরুত্তর ছিলেন	—	৬	৬	৮	২৬	২	৭	২	৫৭
প্রশ্ন ৪ ধূমকেতু সম্বন্ধে যাঁরা বিস্তারিত কিছু জানতে চান	৮	১	১৩	১৫	২৮	—	১৬	—	৮১

আমাদের পশ্চিম বাংলা সমেত ভারতের অন্য ভাষাভাষী অঞ্চলের গ্রাম এবং শহর মিলিয়ে ৪৭ জন সাধারণ মানুষ ছিলেন নিম্নবিত্ত শ্রেণীর। এঁদের অধিকাংশই হলেন নিরক্ষর, সামান্য কিছু লোকের কেবল স্বাক্ষরজ্ঞান ছিল। ৪৭ জনের মধ্যে ৪০ জন ধূমকেতুকে অমঙ্গলজাতীয় কোন কিছু মনে করে বসে আছেন এটা এঁদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত নয়। ভারতবর্ষের বহু শতাব্দী কালের ইতিহাসে দেখা যায় গ্রামীণ সভ্যতার পরিসরে প্রাচীন সমাজ ছিল নিরুপদ্রব কৃষিনির্ভর স্থিতিশীল। যেটুকু তার মধ্যে গতি দেখা যেত সেটা মূলতঃ ধর্মীয় বিশ্বাস এবং লোকাচার-কুসংস্কারের নানা রসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার দ্বারা আন্দোলিত হত। এরই সঙ্গে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং শিক্ষার অভাব মিলেমিশে ছিল। এতে আমাদের সমাজে নিরুত্তম প্রশ্রয় পেয়েছে, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি জাগেনি। আজও এর জের চলেছে। কিন্তু আশার কথা সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করুন ৪৭ জনের মধ্যে ১৬ জন অন্তত ধূমকেতু সম্বন্ধে কিছু জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ আজকের এই আধুনিক যুগে সমাজব্যবস্থার যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে তার জন্য এঁরা পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সজাগ হয়ে উঠতে চাইছেন, কিন্তু এখনও স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারছেন না, পথটা ঠিক খুঁজে পাচ্ছেন না। ধূমকেতু সম্বন্ধে এঁরা কিছু জানার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু কাজটা কীভাবে সম্পন্ন করবেন সেটাও এঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সকলেরই প্রায় এক রকম সরল স্বীকারোক্তি ছিল, আপনারা বাবুলোক, অনেক কিছু জানেন, আপনারা আমাদের বুঝিয়ে দেবেন, আমরা বোঝার চেষ্টা করব। এঁদের জন্য কিছু করার দায়িত্ব আছে কি না এটা আজ যেন আমরা একটু ভেবে দেখি। ১৮ জন মহিলাই ছিলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের এবং এঁরা সকলেই অল্পবিস্তর শিক্ষিত। আমরা জানি কীভাবে নানান সমস্যায় প্রপীড়িত হয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়েদের দিন কাটাতে হয়। বিশ্বরহস্যের কার্যকারণ জানার ব্যাপারে এঁদেরও যথেষ্ট কৌতূহলী করে তোলা যায়, কিন্তু

সমস্যাটা হল ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে ছকে বাঁধা জীবন নিয়ে যেভাবে এঁদের দিন কেটে যায় এই অবস্থায় এঁরা প্রচণ্ডভাবে আত্মমগ্ন হয়ে উঠতে বাধ্য এবং রক্ষণশীলতা এবং দৈব-সংস্কারে বিশ্বাসও সহজে ত্যাগ করতে পারেন না। আসলে বৃহত্তর সামাজিক বোধ, দৃষ্টির প্রসারতা, বুদ্ধির চর্চা যতক্ষণ না পর্যন্ত গভীরে শেকড় চালাতে পারছে ততক্ষণ বস্তুবাদী বিজ্ঞানকে ভালবাসার কাজটা দেরী হয়ে যাবে। শিক্ষিত সাধারণ চাকুরেদের কথাটাই ধরুন। ধূমকেতু সম্বন্ধে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে, লক্ষ্য করুন ৬ জন ব্যক্তির অল্পবিস্তর জানাই আছে যে ধূমকেতু কী এবং এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই ধূমকেতু সম্বন্ধে আরও আগ্রহ প্রকাশ করছেন। অথচ এঁদের মধ্যেই আবার ১০ জন ধূমকেতু সম্বন্ধে আজগুবি ধারণা পোষণ করেন। অর্থাৎ এক দিকে এঁরা বস্তুবাদী বিজ্ঞানের বৈচিত্র্য এবং কৃতিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন, অন্য দিকে আবার মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণাগুলোকেও ত্যাগ করতে পারছেন না। এ হল এক ধরণের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, আমাদের খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। কিন্তু এর থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া দরকার। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষিত বেকারের কথা আমরা একযোগে ভাবতে পারি, কারণ এঁরা সকলেই একটা জায়গায় একই ধরণের বিশেষ ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলেছেন। সেটা হল আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা। এঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মনে হয়েছে যে ধরণের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এঁদের শিক্ষিত হতে হয় তাতে এঁরা সকলেই অতৃপ্ত। শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য হল মানুষকে উদ্যমী, অনুসন্ধিৎসু এবং সংস্কারমুক্ত করে তোলা। এরই মধ্য দিয়ে মানুষের বৈজ্ঞানিক এবং সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে এবং সাংস্কৃতিক সত্তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ সম্ভব হয়। কিন্তু আজকের এই বিংশ শতকে আমাদের দেশে, কি পশ্চিম বাংলায় কি অন্যত্র, জটিল সামাজিক পরিস্থিতিতে নিয়তই প্রতিক্রিয়াশীল পরিবেশের সঙ্গে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। বাহ্যিক বিচারে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার একটা জৌলুষ

আছে বলে মনে হবে। কিন্তু আসলে এই শিক্ষা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজনভিত্তিক নয়। আমাদের শিক্ষা আমাদের বলে দেয় না আমাদের কী আছে, কী নেই, কী আমাদের থাকা উচিত, কীভাবে তাকে কাজে লাগিয়ে মানসিক উৎকর্ষতাকে বাড়িয়ে তোলা যায়। নিদারুণ দুঃখ জনক এই অবস্থার মধ্যেও এমন কয়েকজন বুদ্ধিদীপ্ত এবং যুক্তিবাদী শিক্ষক ও তরুণকে পেয়েছি-লাম যাঁরা শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সমাজের কথা ভাবছেন, বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করছেন। ধূমকেতু যে কী এটা এঁরা সংক্ষেপে সুন্দর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এঁর সমস্ত রকম অলৌকিক ভাবনা মুক্ত ছিলেন।

৪

ধূমকেতু নিয়ে আমাদের বস্তুভাবনার প্রথম পর্যায়

প্রশ্ন উঠতে পারে ধূমকেতু সম্বন্ধে আজ আমাদের বিজ্ঞানভিত্তিক যে-জ্ঞান গড়ে উঠেছে এটা নিশ্চয়ই একদিনে দানা বাঁধেনি। এর পিছনেও একটা ধারাবাহিকতা আছে, দীর্ঘ দিনের ইতিহাস জমে আছে। কিন্তু কী সেই কাহিনী?

বলার অপেক্ষা রাখে না যুগ যুগ ধরে ধূমকেতু নিয়ে আমাদের বস্তুবাদী আগ্রহ-কৌতূহল যেভাবে বিবর্তিত হয়ে আজকের এই আধুনিক জ্ঞানে পর্যবসিত হয়েছে তার একটা অসাধারণ রোমাঞ্চকর ইতিকথা আছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে তারই কয়েকটা বিশিষ্ট দিক সংক্ষেপে আমারা একটু বিবৃত করব।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের যাকে বলে বুনিয়াদী জ্ঞান, তার গড়ে ওঠার পিছনে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের একটা চাহিদা ছিল। তখন নদীর তীরে সভ্যতা বাসা বাঁধছে, কৃষিকাজ গড়ে উঠছে, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান পালন করায় প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে, অন্য নানা ধর্মীয় কাজকর্মের প্রচলনও শুরু হচ্ছে। দিন-রাত্রির নির্দেশ, ঋতু-নির্ণয়, বছর-গণনা, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি, পূর্ণিমা-অমাবস্যা, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, সূর্যের গতি (আপাত), এক-এক ঋতুতে নক্ষত্রপটের পরিবর্তন, নক্ষত্রপটে গ্রহদের স্থান-পরিবর্তন, এই সব সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা থাকা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। এই সব কাজের ভিত্তিতেই একদিন রাশিচক্র, ক্রান্তিবৃত্তের অয়নচলন, পঞ্জিকা প্রণয়ন ইত্যাদি সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ধূমকেতু নিয়ে এই ধরণের কোন প্রয়োজনীয়তাই আমাদের কখনও দেখা দেয়নি। ধূমকেতু ন'-মাসে ছ'মাসে আকাশে দেখা দেয়। আবার এই থাকে, এই মিলিয়ে

যায়। ধূমকেতুর দ্বারা আমাদের ব্যবহারিক জীবনের কোন প্রশ্নই আলোড়িত হয়না। এই কারণে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানান কূট প্রশ্ন নিয়ে আগেকার দিনে আমরা যে-পরিমাণ কাজ করে গিয়েছি তুলনায় ধূমকেতু সম্বন্ধে আমাদের কাজকর্ম অত্যন্ত সীমিত ছিল। এবং শুধু তাই নয়, প্রাচীনকালে আমরা যে-ধরণের ধূমকেতুচর্চা করে গিয়েছি তার দ্বারা আমরা তেমন উপকৃতও হই না। তথাপি সেসব কথা আমাদের একটু জানতে হবে।

আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে ধূমকেতু সম্বন্ধে জ্ঞানের চর্চায় পৃথিবীর সব দেশকে টেক্কা দিয়েছিল প্রাচীন চীন। তাঁরা যেসব বিবরণ[১] লিখে গিয়েছিলেন তার মধ্যে সর্বপ্রথম ধূমকেতু সম্বন্ধে যে-উল্লেখ আমরা পাই তার বছরটা ছিল ৬১৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে[২]। এটা কিন্তু হ্যালির ধূমকেতু নয়। চীনের বিবরণে হ্যালির ধূমকেতু আমরা উল্লেখ পেয়েছিলাম ২৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। যাবতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের লেখক মনে করেন চীনের বিবরণেই হ্যালির ধূমকেতুর প্রথম উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে এবং ২৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্বে হ্যালির ধূমকেতুকে দেখার কোন উল্লেখ পৃথিবীর আর কোন বিবরণে পাওয়া যায়নি। কিন্তু এই প্রচলিত মত আমরা মেনে নিতে পারছি না। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন মহাবীরের জীবনী সংক্রান্ত জৈনদের কল্পসূত্র নামে এক আগমগ্রন্থ আছে, সেখানে ৫৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কার্তিক কৃষ্ণঅমাবস্যায় ভস্মরাশিগ্রহ নামে একটি ধূমকেতু দৃষ্ট হওয়ার কথা আছে।

তবে একটা কথা। আগেকার দিনে পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে প্রাচীন চীনের ঐতিহাসিক বোধ ছিল প্রখর, তাঁদের ক্রনিকল লিখে রাখার অভ্যাস ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এঁরা ধূমকেতুর কথা লিখে রাখতে শুরু করেছিলেন। তাঁদের ধূমকেতু-পর্যবেক্ষণের মধ্য থেকে যদিও তাত্ত্বিক কোন চিন্তাভাবনা বেরিয়ে আসে না, তথাপি তাঁদের উদ্যমকে বার বার সাধুবাদ জানাতে হয়। যাই হোক,

তাঁদের বিবরণে ধূমকেতু সম্বন্ধে যেসব তথ্য আমরা পেয়েছি তার কিছু নমুনা দেওয়া যাক। যেমন,

(১) প্রাচীন চীনবাসীরা সাধারণ নক্ষত্র ছাড়া আজ যাকে আমরা নবতারা বা nova বলি তাকে বলেছিলেন অতিথি তারা (guest star), আর ধূমকেতুকেও নক্ষত্রজাতীয় মনে করে নিয়েছিলেন তবে বিশিষ্টভাবে তাকে একটু আলাদা করে নিয়ে কখনও বলেছিলেন লোমশ তারা বা po-hsing, কখনও বলেছিলেন সমার্জনী তারা বা hui-hsing।

(২) আজ আমরা জানি ধূমকেতুর লেজ বহুধাবিভক্ত হতে পারে। ৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এক চৈনিক বিবরণে ধূমকেতুর এই ধরণের লেজের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৩) ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের এক বিবরণে[৩] জানতে পারা যায় ধূমকেতুর লেজ সূর্যের বিপরীতমুখী অবস্থায় থাকে। রাজকীয় জ্যোতির্বিদরা বর্ণনা দিয়েছিলেন যদি সন্ধ্যাকাশে ধূমকেতুকে দেখতে পাওয়া যায় তাহলে এর লেজ পূবমুখো হয়ে থাকবে, আর উষাকালে দেখা দিলে এর লেজ পশ্চিমের দিকে মুখ করে থাকবে।
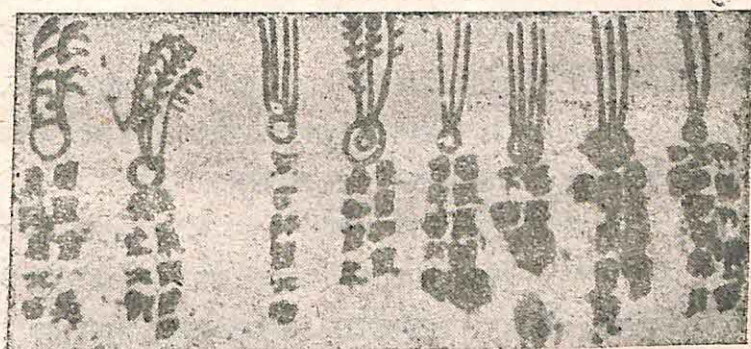
ধূমকেতু মানচিত্র। চীনের জাওয়ানদুঈ নামে এক জায়গায় ১৬৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের হানরাজাদের সমাধিক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত রেশমের উপরে লেখা।

(৪) চীনের বিবরণে বর্ণনা আছে ধূমকেতুর নিজস্ব কোন আলো নেই, কিন্তু সূর্যের আলো ধার করেই এরা আলোকিত হয়।

(৫) চৈনিক বিবরণে দাবী করা হয়েছে ধূমকেতুর লেজ বিভিন্ন রঙের আভা ছড়িয়ে দিতে পারে।

চীনের কথা বাদ দিয়ে সমকালীন দিনগুলোয় অন্য দেশে কে কোথায় ধূমকেতু নিয়ে কী ধরণের চিন্তা করছিলেন আমরা এখন তার কথায় আসছি। মনে পড়ে যাবে এ্যারিস্টটলকে (৩৮৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ)। বলা হয় এ্যারিস্টটলের পাণ্ডিত্যের প্রভাবে মধ্য প্রাচ্য এবং ইউরোপের মানুষ প্রায় আঠারো শতক ধরে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে এ্যারিস্টটল যাথার্থে জ্যোতির্বিদ ছিলেন না। অথচ মজার কথা তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের অজস্র কথা বলে গিয়েছিলেন। এ্যারিস্টটল একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তার মধ্যে একখানা গ্রন্থের নাম হল Meteriologica। এই বইয়েই তিনি ধূমকেতুর কথা বলে গিয়েছেন। তাঁর ধারণা ছিল পৃথিবী এবং চন্দ্রমণ্ডলের মাঝখানের জায়গাটা বেবাক ফাঁকা নয়। সেটা এমন একটা স্তর যেখানে বহু রকমের পদার্থের উৎপত্তি হচ্ছে। যেমন, পাথর, খনিজ পদার্থ, ধূমকেতু, উল্কা ইত্যাদি। এ্যারিস্টটল বলতেন পৃথিবী হল একটা গোলক, কিন্তু এমন অবস্থায় আছে যে এর অভ্যন্তরটা হল প্রচণ্ড উত্তপ্ত এবং গলিত। মাঝে মাঝেই বাষ্প এবং ধোঁয়া বাইরে বেরিয়ে আসছে এবং তৎক্ষণাৎই উপরে উঠে যাচ্ছে, একেবারে ঊর্দ্ধ বায়ুমণ্ডল স্তরে প্রায় চন্দ্রলোকের কাছাকাছি জায়গাটায়। এ্যারিস্টটল আরও ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন কখনও কখনও এই ধোঁয়া এবং বাষ্প পরস্পরের মধ্যে একটা সংঘর্ষে পড়ে গিয়ে জ্বলে ওঠে। এবং যখনই পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসে তখনই সেই দীপ্তিমান বস্তুকে আমরা দেখতে পাই। তখনই তাকে মনে করতে হবে ধূমকেতু।

এ্যারিস্টটলের পর অন্তত দেড় হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর অক্সফোর্ডের এক পণ্ডিত ব্যক্তি গ্রোসেটেস্টে (Grosseteste—১১৭৫-১২৫৩) আবার ধূমকেতুর প্রসঙ্গ তুলে ধরলেন। এ্যারিস্টটলীয় ধারণাকে আংশিক সমর্থন জানিয়ে তিনিও মনে করে নিয়ে-

ছিলেন ধূমকেতু বায়ুমণ্ডলের অনেক উপরের স্তরে জ্বলে ওঠা এক ধরণের আগুণ, তবে এ্যারিস্টটলের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য হল তিনি বললেন এ আগুন সর্বদাই স্থায়ীভাবে মহাকাশে আছে। আকাশের কোন নক্ষত্র যখন এই আগুনকে আকর্ষণের জোরে নিজের কাছে টেনে রেখে দেয় তখন আর তাকে দেখা যায় না কিন্তু ধাক্কা দিয়ে যখন নিজের কাছ থেকে পৃথিবীর দিকে ঠেলে দেয় তখনই সে আমাদের আকাশে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

এ্যারিস্টটল অথবা গ্রোসেটেস্টে, যাঁর কথাই আমরা বলি না কেন, ধূমকেতু নিয়ে এঁদের কথাবার্তা আধুনিক জ্ঞান অনুযায়ী নিতান্তই হাস্যকর এবং অর্থহীন মনে হবে। সেটা কিন্তু খুব দোষের কথা নয়। কতদিন আগেকার কথা, ধূমকেতু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানই তখন গড়ে ওঠেনি, সেই হিসেবে এঁদের বক্তব্যকে নস্যাৎ করে দেওয়া অনুচিত। আসলে ধূমকেতুকে কেন্দ্র করে তাঁরা আমাদের বস্তুভাবনার একটা ঐতিহ্য গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। এর মূল্য আছেই।

এই ঐতিহ্য অনুসরণ করেই এঁদের আরও কিছু উত্তরসূরী ষোল-সতেরো শতকে ধূমকেতু নিয়ে আবার বিজ্ঞানভাবনায় মেতে উঠেছিলেন। একযোগে এই সময় আমরা পাঁচজন প্রতিভাধর মানুষকে পেয়েছিলাম। এঁরা হলেন ব্রাহে (Tycho Brahe), কেপলার (Johannes Kepler), গ্যালিলিও (Galileo Galilei), নিউটন (Isaac Newton) এবং হ্যালি (Edmond Halley)। এঁদের মধ্যে ব্রাহে, কেপলার এবং গ্যালিলিও অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে জন্মেছিলেন, আর নিউটন এবং হ্যালির জন্ম হয়েছিল আরও পরে। এঁদের সমসাময়িক আর যেসব বিজ্ঞানী ধূমকেতু নিয়ে কাজে নেমেছিলেন তাঁরা এমন কিছু বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না, কিন্তু এঁদের কাজেরও কিছু গুরুত্ব আছে। অতএব এই প্রসঙ্গে এঁদের কথাও আমরা একটু উল্লেখ করব।

ব্রাহে সম্বন্ধে নির্দ্বিধায় বলা চলে ধূমকেতু সংক্রান্ত আধুনিক

বিজ্ঞানভিত্তিক কাজের তিনিই প্রথম পত্তন করে যান। তিনি যথার্থ বুঝেছিলেন ধূমকেতু উর্দ্ধ বায়ুমণ্ডলের নৈসর্গিক কোন ঘটনা নয়, চন্দ্রলোকের নিচের স্তরেও তার স্থান নেই. ধূমকেতু স্থির নয় কিন্তু গতিশীল, ধূমকেতু সম্পূর্ণ আলাদা এক জ্যোতিষ্ক। অবশ্য ১৫৭৭ সালে আকাশে বিরাট এক ধূমকেতু দেখে প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল ওটা বোধহয় একটা নবতারা বা nova। হঠাৎই আকাশে অসম্ভব রকমের উজ্জ্বল হয়ে ফুটে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু পরে আরও গভীরে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তিনি ধরে ফেললেন জ্যোতিষ্কটা থেকে নবতারার মতন তীক্ষ্ণ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে না, কিন্তু একটা মোলায়েম স্নিগ্ধ দীপ্তি আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। এমন কি নক্ষত্রদের মতন আকাশপটে স্থির হয়েও নেই, কিন্তু তার অবস্থানের পরিবর্তন ধরা পড়ছে। ব্রাহের বুঝতে বাকি রইল না জ্যোতিষ্কটা হল একটা ধূমকেতু। তিনি ধূমকেতুটার লম্বন (parallax) নির্ণয় করতে চেষ্টা করলেন এবং এইটুকু বুঝলেন যে চাঁদের লম্বনের চেয়ে এর লম্বন অনেক কম এবং সেই হিসেবে ধূমকেতু চন্দ্রলোকের বাইরে আরও দূরে অবস্থিত। ধূমকেতু সম্বন্ধে তাঁর যাবতীয় পর্যবেক্ষণ-চিন্তাভাবনার ফলাফল তিনি তাঁর একখানা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে যান।

তাঁর পর এই সূত্র ধরেই ধূমকেতুচর্চার হাল ধরেছিলেন কেপলার (১৫৭১-১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ)। কেপলার আসলে ব্রাহেরই সহকারী ছিলেন এবং তাঁর দ্বারাই একদিন জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে কেপলারের স্থান আজও খুব উঁচুতে। গ্রহেরা সূর্যের চারদিকে কী ধরণের পথ ধরে ঘোরে এর নিপুণ ব্যাখ্যাতা হিসেবে কখনও তাঁকে ভোলা যায় না। তথাপি তিনি ধূমকেতুর কথাও চিন্তা করেছিলেন এবং De Cometes (About Comet), (মূল বইখানা ছিল লাতিন ভাষায় লেখা) নামে একখানা বইও তিনি লিখে ফেলেছিলেন, ১৬১৯ সালে। কেপলার মনে করেছিলেন ধূমকেতু অনন্ত মহাশূন্যের গভীরতম কোন প্রদেশ

থেকে সরল রেখায় চলতে চলতে সূর্যের কাছে এসে হাজির হয়। এবং তারপর ওই সোজা পথেই আরও সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে মহাশূন্যের গভীরেই চিরকালের মতো হারিয়ে যায়। এখানে আমাদের বক্তব্য হল গণিতে যাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল এবং এই জ্ঞান নিয়ে যিনি তিনটি সূত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন যে গ্রহেরা সূর্যের চারদিকে বৃত্তাকার পথে ঘোরে না, বরং একটা উপবৃত্তের নাভিমূলে (focus) সূর্যকে রেখে তার চারদিকে পরিক্রমা করে, এরই ভিত্তিতে তিনি যদি ধূমকেতুর কক্ষপথ বিচারের কথা ভাবতেন তাহলে বেশ কিছু অজ্ঞাত বিষয় তিনি সহজ করে আনতে পারতেন।

কেপলারের দ্বিতীয় দাবী ছিল সমুদ্রে তিমি মাছেরা যেমন অগণিত সংখ্যায় থাকে তেমনি ধূমকেতুর সংখ্যাও গুণে শেষ করা যায় না। কেপলার আর একটা খুব উল্লেখযোগ্য কথা বলেছিলেন যে সূর্যের নিকটতম জায়গায় ধূমকেতু এলে তার কিছু মালমসলা ক্ষয় হয়ে যায়। এই দুটো উক্তিই খুব খাঁটি সত্য। কিন্তু কেপলার এই সব দাবীর পিছনে কোন যুক্তির অবতারণা করেন নি। কেপলারকে সমর্থন জানিয়েও আমরা বলতে বাধ্য যে তাঁর মনোভাব এখানে বোঝা শক্ত।

আবার কেপলারের সমসাময়িক যুগেই আমরা পেয়েছিলাম গ্যালিলিওকে। ধূমকেতুকে গ্যালিলিও অবশ্যই এক স্বতন্ত্র চরিত্রের জ্যোতিষ্ক মনে করেছিলেন, জ্যোতিষ্কজগতের নিয়মকানুন ভঙ্গকারী খাপছাড়া কোন জ্যোতিষ্ক মনে করে নিতে পারেন নি। বলবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এটা অনুধাবন করা তাঁর পক্ষে এতটুকু কঠিন হয়নি যে একটা জ্যোতিষ্ক হিসেবে ধূমকেতু কখনই সরল রেখায় চলতে পারে না। তিনি বিশ্বাসই করতেন ধূমকেতু সূর্যের আকর্ষণেই তার চারদিকে ঘোরে। তবে গ্যালিলিওর ধারণা ছিল ধূমকেতুর কক্ষপথ বৃত্তাকার ছাড়া অন্য কিছু নয়। এখানে অন্য আর একটা কথা আছে। আমরা জানি গ্যালিলিও

দূরবীণযন্ত্রের উদ্ভাবক ছিলেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য যে দূরবীণ যন্ত্র ব্যবহারের দ্বারা তিনি ধূমকেতু দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। ধূমকেতু তিনি দেখেছিলেন ১৬০৬ সালে। তখন তিনি দূরবীণযন্ত্র নির্মাণের কাজই শেষ করে উঠতে পারেন নি। দূরবীণযন্ত্র তিনি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ১৬০৯ সালে, চাঁদ দেখার কাজে। দূরবীণ ব্যবহার করার সুযোগ পেলে মনে হয় তাঁর ধূমকেতু বিচার আরও একটু গভীরে পৌঁছতে পারত।

এইভাবে ব্রাহে, কেপলার এবং গ্যালিলিওর সামগ্রিক চিন্তা-কাঠামোর মধ্যে ধূমকেতু সম্বন্ধে এমন কিছু-না-কিছু বস্তুভাবনা খুঁজে পাওয়া গেল যার ফলে সেই সতেরো শতকেই আরও কিছু বিজ্ঞানী ধূমকেতুর কাজে উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। যেমন, স্যার উইলিয়িম লোয়্যর (Sir Willam Lower), সেথ ওয়ার্ড (Seth Ward), হেভেলিয়াস (Hevelius) ডোয়্যরফেল (Doerfel), ইত্যাদি। এঁদের সকলের কাজই আবার একটু বিচিত্র ছিল, প্রায় একই ধরণের। এঁরা ধূমকেতুর কক্ষপথ নির্দ্ধারণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে কোন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে এঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। ১৬১০ সালে বিজ্ঞানী লোয়্যর বলেছিলেন ধূমকেতুর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার (Elliptical), ১৬৫২ সালে সেথ ওয়ার্ডও বললেন ধূমকেতুর কক্ষপথ হয় বৃত্তাকার, নতুবা উপবৃত্তাকার, ১৬৬৮ সালে হেভেলিয়াস বক্তব্য রাখলেন ধূমকেতুর কক্ষপথ অধিবৃত্তাকার (Parabolic) এবং ১৬৮০ সালে ডোয়্যরফেল এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন ধূমকেতু অধিবৃত্তাকার পথেই ঘোরে। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে কেন তাঁরা এই ধরণের কথাবার্তা বললেন? তাঁদের ব্যাখাটা কী ছিল? বলা বাহুল্য এর কোন সদুত্তর নেই।

পাদটীকা

১ প্রাচীন চীনের বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে জোসেফ নীডাম (Joseph Needham) অসামান্য সুন্দর কাজ করেছিলেন।

অষ্টদশ শতাব্দীতে জেসুইট পাদরিরাও চীনাবাসীদের ধূমকেতু সম্বন্ধে লেখা বিবরণগুলোর কিছু পাঠোদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৪৬ সালে ফরাসী জ্যোতির্বিদ এবং চীনা ভাষায় পণ্ডিত বিও (E. Biot) চৈনিক ধূমকেতু বিবরণের আংশিক অনুবাদ করেন। পরে ১৮৭১ সালে ইংরেজ পণ্ডিত জে. উইলিয়ামস (J. Williams) খুব পরিশ্রম করে চৈনিক বিবরণের এক সুসংবদ্ধ ক্যাটালগ তৈরী করেছিলেন।

২ পণ্ডিতেরা দাবী করছেন কনফুসিয়াস ধূমকেতু সম্বন্ধে একটা বিবরণ সম্পাদনা করেছিলেন। এই বিবরণে (Spring and Autumm Annals) সম্রাট ওয়েনের রাজত্বের ১৪ বছরে বসন্তকালে সপ্তম চান্দ্রমাসে সপ্তর্ষিমণ্ডলের (Ursa Major = চীনা Pei-tou) কাছে একটা Po-hsing (চীনা ভাষার ধূমকেতুর নাম) দেখার উল্লেখ আছে।

৩ চিন-শু (Chin-shu) বিবরণ। এটি একটি খুব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের এই বিবরণে তৎকালীন চৈনিক সাম্রাজ্যের কথা আছে। তখন আকাশে একটা ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল। এই বিবরণে তারও কিছু উল্লেখ আছে।

সংযোজন

চীনের বিবরণ অনুসারে ২৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দৃষ্ট হ্যালির ধূমকেতুর অনুসূর-অবস্থান, বছর ইত্যাদির তালিকা ঃ

বছর	ক্রম	প্রথম দৃষ্ট	শেষ দৃষ্ট	অনুসূর-অবস্থান
খ্রী.পূ. ২৪০	১	—	—	২৫ মে
„ „ ১৬৪	২	—	—	১২ নভেম্বর
„ „ ৮৭	৩	আগস্ট	আগস্ট	৬ আগস্ট
„ „ ১২	৪	২৬ আগস্ট	২০ অক্টোবর	১০ অক্টোবর
৬৬ খ্রীষ্টাব্দ	৫	৩১ জানুয়ারী	১১ এপ্রিল	২৫ জানুয়ারী
১৪১ „	৬	২৬ মার্চ	মে	২২ মার্চ

বছর	ক্রম	প্রথম দৃষ্ট	শেষ দৃষ্ট	অনুসূর-অবস্থান
২১৮ খ্রীষ্টাব্দ	৭	এপ্রিল	মে	১৭ মে
২৯৫ „	৮	—	মে	২০ এপ্রিল
৩৭৪ ”	৯	৩ মার্চ	মে	৬ ফেব্রুয়ারী
৪৫১ „	১০	১০ জুন	১৬ আগস্ট	২৮ জুন
৫৩০ „	১১	২৮ আগস্ট	২৭ সেপ্টেঃ	২৭ সেপ্টেম্বর
৬০৭ „	১২	১৮ এপ্রিল	জুলাই	১৫ মার্চ
৬৮৪ „	১৩	৬ সেপ্টেম্বর	২৪ অক্টোবর	২ অক্টোবর
৭৬০ „	১৪	১৬ মে	জুলাই	২০ মে
৮৩৭ „	১৫	২২ মার্চ	২৮ এপ্রিল	২৮ ফেব্রুয়ারী
৯১২ „	১৬	১৯ জুলাই	২৮ জুলাই	১৮ জুলাই
৯৮৯ „	১৭	১১ আগস্ট	১১ সেপ্টেঃ	৫ সেপ্টেম্বর
১০৬৬ „	১৮	১ এপ্রিল	৭ জুন	২০ মার্চ
১১৪৫ „	১৯	২৬ এপ্রিল	৯ জুলাই	১৮ এপ্রিল
১২২২ „	২০	৩ সেপ্টেম্বর	২৩ অক্টোবর	২৮ সেপ্টেম্বর
১৩০১ ”	২১	১৫ সেপ্টেম্বর	৩১ অক্টোবর	২৫ অক্টোবর
১৩৭৮ ”	২২	২৬ সেপ্টেম্বর	১০ নভেম্বর	১০ নভেম্বর
১৪৫৬ ”	২৩	২৬ মে	৮ জুলাই	৯ জুন
১৫৩১ ”	২৪	১ আগস্ট	৮ সেপ্টেম্বর	২৬ আগস্ট
১৬০৭ ”	২৫	২১ সেপ্টেম্বর	২৬ অক্টোবর	২৭ অক্টোবর
১৬৮২ ”	২৬	২৪ আগস্ট	২২ সেপ্টেঃ	১৫সেপ্টেম্বর
১৭৫৯ ”	২৭	২৫ ডিসেম্বর'৫৮	২২ জুন	১৩ মার্চ
১৮৩৫ ”	২৮	৫ আগস্ট	১৯ মে	১৬ নভেম্বর
১৯১০ ”	২৯	২৫ আগস্ট ১৯০৯	২৬ জুন ১৯১১	২০ এপ্রিল

৫

ধূমকেতু চর্চার নতুন দিক

গ্যালিলিওর যুগ পার হয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল ধূমকেতু নিয়ে আগেকার দিনের কাজকর্মের রীতিপদ্ধতি সব কিছুই বদলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে নিউটন এসেছেন। তাঁর অভিকর্ষতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিউটনের এই অভিকর্ষবাদের জন্যই হোক কিংবা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পরীক্ষানির্ভর এবং বিশ্লেষণ মূলক কাজকর্মগুলো গড়ে ওঠার জন্যই হোক, বিজ্ঞান তখন ক্রমশই তার বিপ্লবাত্মক ভূমিকা নিয়ে আরও সামনের দিকে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে। বলার অপেক্ষা রাখে না নিউটনের আগে ধূমকেতু নিয়ে আমরা যে-ধরণের কাজকর্ম করেছিলাম তার বস্তুবাদী মূল্যকে কেউই আমরা অস্বীকার করতে পারি না, কিন্তু আমাদের সেই সব কাজ কখনও গভীরে গবেষণাধর্মী হয়ে উঠতে পারেনি। নতুন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানীদের কাছে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার হয়ে এল ধূমকেতু নিয়ে আমাদের এমন কিছু প্রশ্নজিজ্ঞাসা জমা হয়ে আছে তাত্ত্বিক স্তরে সেই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এবং এর জন্য সুনির্দিষ্ট ধারায় গাণিতিক অনুশীলনের পদ্ধতি গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মেজাজে ধূমকেতু নিয়ে যিনি প্রথম কাজে নেমেছিলেন তাঁর নাম আমাদের সকলের কাছেই পরিচিত। তিনি হলেন এডমণ্ড হ্যালি (Edmond Halley)[১]। বাস্তবিক তাঁকে বাদ দিয়ে ধূমকেতু চর্চার কথা ভাবাই যায় না। ধূমকেতু নিয়ে তিনি যে-ধরণের কাজের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন এতটুকু সংশয় না করেই বলা যায় তিনি যদি না আসতেন তাহলে ধূমকেতু সম্বন্ধে আমাদের আধুনিক জ্ঞান আরও বহু বছর পিছিয়ে

যেত। হ্যালি কিন্তু নতুন কোন ধূমকেতু আবিষ্কার করেন নি, এমন কি ধূমকেতু যে প্রকৃতপক্ষে কী ধরণের জ্যোতিষ্ক, কেমন তার গঠন, কী তার উপাদান, তার কাজের পদ্ধতি কেমন, তার সৃষ্টিরহস্য বলতেই বা আমরা কী বুঝি, এই সব সাত-সতেরো কোন প্রশ্নের মীমাংসা করেও তিনি যশস্বী হননি। তিনি শুধু ধূমকেতুর পরিক্রমণপথ এবং তার আসা-যাওয়ার সময়কালের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু এটা এমন একটা সমস্যা যে এই একটা প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই ধূমকেতু সংক্রান্ত আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে। হ্যালির কৃতিত্ব ছিল তিনি অন্তত একটা ফাঁস মুক্ত করতে পেরেছিলেন।

ধূমকেতু নিয়ে একটা কিছু ভাল কাজ করার যোগ্যতা যে হ্যালির ছিল এটা তাঁর চরিত্র পর্যালোচনা করলেই বুঝতে পারা যায়। তিনি ছিলেন অসাধারণ কৃতি পুরুষ, জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আরও কত সুন্দর কাজ করে গিয়েছেন। ধনীর ঘরে তাঁর জন্ম হয়েছিল, সারাটা জীবন বিলাস-ব্যসন, আলস্যে কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। বৃহত্তর কাজের টানে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। মাত্র ২০ বছর যখন তাঁর বয়স তখন অক্সফোর্ডের কুইন্স কলেজে কিছুদিন পাঠ নিয়ে তিনি পাড়ি জমিয়েছিলেন দক্ষিণ গোলার্ধে। সেন্ট হেলেনা দ্বীপে টানা দেড়টি বছর কাটিয়ে দিয়ে দক্ষিণ আকাশের উজ্জ্বল এবং সম-উজ্জ্বল ৩৪১টি নক্ষত্রকে নথিভুক্ত করে নিয়ে আসেন। এ কাজ আগে কেউ কখনও করেন নি। আবার ২৪ বছর যখন তাঁর বয়স তখন নিজেই তিনি অভিকর্ষ (gravitation) সম্বন্ধে কিছু কথা ভেবেছিলেন। এ ছাড়া নক্ষত্রেরা যে স্থির নয়, তাদেরও নিজস্ব গতি বা Proper Motion আছে এ কথা হ্যালিই প্রথম বলেছিলেন। আবার সমুদ্রের জলে সঞ্চিত লবণের পরিমাণ নির্ণয় করে পৃথিবীর বয়সও যে মোটামুটি আন্দাজ করা যায় এ কথাও তাঁর আগে কেউ কখনও বলেন নি।

এই হ্যালির বয়স যখন চব্বিশ তখন তিনি আকাশে এক ধূমকেতু দেখেছিলেন। প্যারিস থেকে, ১৬৮২ সালে। বিরাট এক ধূমকেতু, তেমনি সুন্দর দেখতে। অন্ধকার আকাশের বুক চিরে স্নিগ্ধ দীপ্তিতে লেজের মতন বিরাট আকার নিয়ে আকাশে উঠত। সূর্যাস্তের পরও তাকে আকাশে দেখা যেত। হ্যালি তাঁর সমস্ত আগ্রহ নিয়ে নির্মিমেষ চোখে সেই ধূমকেতুর দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন। কিন্তু যতই দেখতেন ততই তাঁর মনের অশান্তি বেড়ে যেত। কী অদ্ভুত জ্যোতিষ্ক এই ধূমকেতু, রহস্যে ঘেরা, বলতে গেলে এর সম্বন্ধে তিনি কিছুই তেমন জানেন না। কিন্তু হ্যালি অটল। সেই অতি তরুণ বয়সেই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ধূমকেতু সম্বন্ধে আর কিছু না হক অন্তত তার পরিক্রমণপথ এবং আকাশে তার অদ্ভুতভাবে হাজিরা দেওয়ার ব্যাপারটা জেনে নিতে হবে। বলা বাহুল্য কাজটা এতটুকু সহজ ছিল না। বিশেষ করে হ্যালির যুগে। তখন ধূমকেতু সম্বন্ধে কীই বা এমন আমরা জানতাম।

হ্যালির প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ধূমকেতু সংক্রান্ত কাজে তিনি কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন নি। ১৬৮২ থেকে ১৭০৪ সাল এই বাইশ বছর পর্যন্ত কখনও তাঁকে রয়েল সোসাইটির সম্পাদকের কাজকর্ম করে যেতে হয়েছে, কখনও রাজকীয় টাঁকশালের সহকারী অধ্যক্ষের কাজ চালাতে হয়েছে, কখনও বা তাঁকে নৌ-জ্যোতির্বিদ্যার কাজে জাহাজের কাপ্তেন হিসেবে সমুদ্রে পাড়ি জমাতে হয়েছে। এই সব নানান কারণে ধূমকেতু সংক্রান্ত গবেষণার কাজ আপাতত তাঁকে স্থগিত রাখতে হয়েছিল। মাঝেমধ্যে কেবল প্রাথমিক স্তরে কিছু ভাবনাচিন্তা নিয়ে নিমগ্ন ছিলেন। যেমন,

(১) হ্যালি বুঝেছিলেন ধূমকেতু অমঙ্গলের কোন প্রতীক নয়। ধূমকেতু আর পাঁচটা জ্যোতিষ্কের মতনই আকাশের এক জ্যোতিষ্ক।

(২) ধূমকেতুর সঙ্গে ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের কোন যোগ নেই। ধূমকেতু সৌরমণ্ডলেরই অন্তর্ভুক্ত।

(৩) ধূমকেতু সৌরজগতের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেও গ্রহজাতীয় কোন জ্যোতিষ্ক নয়।

(৪) গ্রহেরা সূর্যের চারধারে একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে যেমন সূর্য-পরিক্রমা করে ধূমকেতুও সেই রকম একটা বিধিনিয়ম মেনে সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

১৭০৪ সাল থেকে অবশেষে হ্যালি তাঁর জীবনে একটু সুস্থির হয়ে বসার সুযোগ পেলেন। ১৭০৪ সালে তাঁর কাছে অক্সফোর্ডের জ্যামিতির প্রধান অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করার আমন্ত্রণ এল। এই ধরণের মনোমত কাজই তিনি বরাবর চাইছিলেন। লেখাপড়া সংক্রান্ত কাজ, প্রচুর অবকাশ আছে, ধূমকেতু নিয়ে গবেষণার কাজে তিনি মেতে থাকতে পারবেন। ধূমকেতু সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাকে গ্রথিত করার অবসরে সাড়ে তিনশো বছরের একটু বেশী অর্থাৎ ১৩৩৭ সাল থেকে ১৬৯৮ সাল পর্যন্ত নথিভুক্ত সমস্ত ধূমকেতু সম্বন্ধে হ্যালি তথ্য সংগ্রহ করলেন। এইসব নথিপত্রে উল্লিখিত ধূমকেতুদের মধ্য থেকে তিনি আবার ২৪টি ধূমকেতুকে বেছে নিলেন এবং এদের পরস্পরের মধ্যে আসা-যাওয়ার সময়ের একটা তুলনামূলক হিসেব কষতে বসলেন। প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে বার বার করে দুটি বছর তাঁর মন অধিকার করে রইল। একটা হল ১৫৩১ সাল, আর অন্যটা হল যে-বছর তিনি নিজে ধূমকেতু দেখেছিলেন, অর্থাৎ ১৬৮২ সাল। এই দুই বছরের ভিত্তিতে তিনি গণনা করতে শুরু করলেন। আরও একটা বছর বেরিয়ে এল। ১৬০৭ সাল। এই বছরেও আকাশে একটা ধূমকেতু দেখা দিয়েছিল। এই তিনটে বছর, অর্থাৎ ১৫৩১, ১৬০৭ এবং ১৬৮২ সালের মধ্যে ৭৬ বছরের নির্দিষ্ট একটা ব্যবধান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। লোকে ভাবতেন এরা সবই আলাদা আলাদা ধূমকেতু। কিন্তু হ্যালিই প্রথম প্রশ্ন তুললেন, তা নয়, ওরা একই ধূমকেতু, পালা করে ৭৬ বছর অন্তর আকাশে দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর এই অনুমানের স্বপক্ষে নির্ভরযোগ্য গাণিতিক-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সমর্থন

পাওয়ার চেষ্টা করলেন। এই সংকটে হ্যালি নিউটনের শরণাপন্ন হলেন।

সমকালীন দিনগুলোয় নিউটনের তুল্য খ্যাতিমান গণিতজ্ঞ আর কেউ ছিলেন না এবং এই নিউটনের সঙ্গে ছিল হ্যালির নিবিড়তম বন্ধুত্ব[৩]। বন্ধুর কাজ আটকে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, কিন্তু নিউটন ছিলেন দরাজ মনের মানুষ, নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচার-অভিজ্ঞতা সব কিছু তিনি হ্যালির কাজে উজাড় করে দিলেন। তিনি নিজেও ধূমকেতু দেখেছিলেন[৪]। তবে, ধূমকেতু সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ হ্যালির তুল্য গভীরে ছিল না। কিন্তু হ্যালির সঙ্গে ধূমকেতু নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে বসে তিনি অনুধাবন করতে পারলেন যে নিজের অভিকর্ষতত্ত্বের সাহায্যেই ধূমকেতুর কক্ষপথের চরিত্রবিচার সম্ভবপর।

অভিকর্ষের বক্তব্যই হল এক বস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের জোর আবার নির্ভর করবে দুটো জিনিসের উপর, একটা হল বস্তুর ভর আর অন্যটা হল দুই বস্তুর মাঝখানের দূরত্ব। সূর্য আকারে বড়, তার ভর বেশী। ধূমকেতু ছোট, তার ভরও কম। তাছাড়া যে-ধূমকেতুকে হ্যালি দেখেছিলেন সেই ধূমকেতু সূর্যের আকর্ষণের আওতার মধ্যেই আছে। এখন সূর্য এবং ধূমকেতু উভয়ের ক্ষেত্রেই অপকেন্দ্রী শক্তি (Centrifugal force) একটা ভারসাম্য অবস্থায় চলে আসছে। এটা সম্ভব হয়েছে উভয়েরই আকর্ষণী শক্তির দ্বারা। অভিকর্ষের সূত্র বলছে, অভিকর্ষ= $\frac{\text{ভরের গুণফল}}{\text{দূরত্বের বর্গফল}}$ অর্থাৎ দুই বস্তুর ভরের গুণফলকে বস্তু দুটির দূরত্বের বর্গ দিয়ে ভাগ করালে যা পাওয়া যাবে তারই উপর নির্ভর করবে আকর্ষণের জোর। এর থেকেই ধরতে পারা যায় অভিকর্ষের জোর যে-দূরত্বের বর্গফলের বিপরীত অনুপাত অনুসারে বদলাতে থাকবে তারই উপর নির্ভর করবে কক্ষপথের আকৃতি[৫]।

এই প্রসঙ্গে হ্যালি আরও দুটো কথা বলে গিয়েছিলেন।

একটা ছিল সতর্কবাণী, আর অন্যটা হল ভবিষ্যদ্বাণী। তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন যে কোন ধূমকেতু তার আবির্ভাবের নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেও সূর্যের কাছে এসে পড়তে পারে কিংবা কিছু দেরীতেও আসতে পারে। যেমন, ১৬০৭ সালে দেখা দেওয়ার পর ৭৬ বছরের হিসেব অনুযায়ী তাঁর ধূমকেতুর আকাশে ওঠার কথা ছিল ১৬৮৩ সালে। কিন্তু কিছু আগেই সে চলে এসেছিল। ১৬৮২ সালে। যে-বছর তিনি নিজে দেখেছিলেন। এর কারণ হল ধূমকেতুর নির্দ্ধারিত চলার পথে কাছাকাছি যদি কোন গ্রহ এসে পড়ে এবং সেটা যদি খুব জবরদস্ত আকারের গ্রহ হয়, যেমন বৃহস্পতি অথবা শনি, তাহলে যেহেতু তাদের ক্ষেত্রেও অভিকর্ষ কাজ করছে, অতএব তাদের সামান্য আকর্ষণেও ধূমকেতুর কক্ষপথের একটু বিচ্যুতি ঘটবেই। ফলে ধূমকেতুর আসা-যাওয়ার সময় বাড়বে-কমবে[৬]।

যাই হক, হ্যালির এত অধ্যবসায়, পরিশ্রম, চিন্তা, আগ্রহ, গবেষণা কোন কিছুই কিন্তু বিফলে যায়নি। তাঁর গণনা যে কত নিখুঁত হয়েছিল ১৭৫৮ সালেই তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।[৭] সে-দিন ছিল বড়দিন। চতুর্দিকে হৈ-হুলুস্থূল, আনন্দের হিল্লোল বইছে। এরই মাঝে ৭৬ বছর বাদে আবার হ্যালির ধূমকেতু আকাশে উঠল। সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই সে-দিন ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। এই বুঝি বা এত বড় একটা উৎসব পণ্ড হয়ে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীমহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ধূমকেতু সংক্রান্ত এত বড় একটা তথ্য অভ্রান্ত প্রতিপন্ন হতে চলেছে দেখে হ্যালির প্রতি তাঁদের মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছিল। হ্যালির নিজের শুধু এইটুকু দুঃখ ছিল যে তিনি তাঁর অত সাধের ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করে যেতে পারেন নি। দীর্ঘায়ু জীবনে ৮৬ বছর বয়সে তিনি মারা যান। আর ষোলটা বছর কোনও রকমে কাটিয়ে দিয়ে শতায়ু হতে পারলেই তিনি তাঁর তত্ত্বের নির্ভুলতা সম্বন্ধে আশ্বস্ত হতে পারতেন।

পাদটীকা

১. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় লেখকেরা এডমণ্ড হ্যালির বানান লিখছেন Edmund Halley। কিন্তু এ বানান ঠিক নয়। হ্যালি নিজে তাঁর নামের বানান লিখে গিয়েছেন Edmond Halley এবং নামের উচ্চারণ করতেন Halley নয়, কিন্তু Hawley।

২. লণ্ডনের উপকণ্ঠ Shoreditch-এ হ্যালি ৮ই নভেম্বর ১৬৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য মতান্তরে কেউ কেউ বলেন হ্যালির জন্মদিন হল ২৯শে অক্টোবর।

৩. হ্যালি এবং নিউটনের বন্ধুত্ব কিংবদন্তির মতন হয়ে আছে। খুব অল্প বয়স থেকেই নিউটনের সঙ্গে হ্যালির আলাপ জমে ওঠে। হ্যালির যখন ২৪ বছর বয়স তখন থেকেই। অভিকর্ষ আলোচনার সূত্রে। নিউটনের কৃতিত্বে হ্যালি এত দূর আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি নিজের উদ্যোগে এবং ব্যয়ে অভিকর্ষ সম্বন্ধে নিউটনের রচনা Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Mathematical Principles of Natural Philosophy) ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় এর সঙ্গে এক ভূমিকা এবং নিউটনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও জুড়ে দিয়েছিলেন।

৪. ১৬৮০ সালের নভেম্বরের ভোরের দিকে নিউটন এক ধূমকেতু দেখেন। খুব ছোট আকারের। তারপর তাকে আর দেখা গেল না। অর্থাৎ সেই ধূমকেতু তখন সূর্যের খুব কাছে চলে গিয়ে সূর্যকে বেড় দিচ্ছে এবং তার ফলে সূর্যরশ্মির প্রচণ্ড উজ্জ্বলতায় তার ছোট্ট দেহটা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। ডিসেম্বরের শেষ থেকে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহগুলোয় সন্ধ্যের দিকে আবার তাকে আকাশে দেখা গেল। অর্থাৎ তার তখন সূর্যকে বেড় দেওয়া শেষ হয়েছে এবং সে তখন সূর্যের এপাশে চলে আসছে। এতেই প্রথম দিকে নিউটনের বিভ্রান্তি ঘটেছিল। তিনি মনে করেছিলেন দুটো ধূমকেতু দেখেছেন। পরে তিনি তাঁর এ ভুল সংশোধন করে নেন। "The comet of 1680-81 which appeared in the morning

in the month of November seems to have been the same comet that was observed in December and January in the evening.''—নিউটনের তৃতীয় গ্রন্থ De Systemate Mundi (The World System) সম্বন্ধে রয়েল সোসাইটির মন্তব্য (দ্রষ্টব্য : The History of the Royal Society)।

৫. "If a new comet appears we could find out by comparison of the elements whether it belongs to the old ones or not, and from its revolution period, and the axis of its path we can predict its return. Various circumstances do urge me to believe that the comet which Apian observed in 1531 was the same as the one described in 1607 by Kepler and Longomontanus and which I myself saw returning in 1682 and observed", (Synopsis Astronomiae Cometicae, Halley : ইংরেজী অনুবাদ Synopsis of Astronomical Comets).

৬. "Saturn's movement is disturbed by the remaining planets, particularly Jupiter to such an extent that its revolution period is uncertain by even a few days. How much more will a comet be dependent on such influences .....", (উপরোক্ত গ্রন্থ).

৭. "If I penetrate deep into the history of Comets, I find a Comet with the same revolution period which was seen in the year 1306 around Easter, which occured before 1456 at double the revolution period namely 151 years. Therefor I think that I can dare to predict that it will return in 1758", (উপরোক্ত গ্রন্থ).

৬

হ্যালির ধূমকেতু সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য

আগেও আমরা একটু আভাস দিয়েছি, এখনও বলব, আধুনিক রীতিপদ্ধতি মেনে ধূমকেতু চর্চার যে-ঐতিহ্য হ্যালি সৃষ্টি করে দিয়ে গিয়েছিলেন, তার জন্য চিরকাল ধরে তাঁর কাছে আমরা ঋণী থাকব। হ্যালির মৃত্যুর পর বেশী দিনও পার হল না, দেখা গেল তাঁর উত্তরসূরী বিজ্ঞানীরা এত দূর অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছেন যে তাঁরা একের পর এক, কেউ বা এককভাবে, কখনও বা যৌথভাবে, ধূমকেতু চর্চার কাজে মেতে উঠলেন। ঠিক যেভাবে হ্যালি কাজ করতেন, তাঁর পরের বিজ্ঞানীরাও সেইভাবে গোছালো ধরণের একেবারে ছকে বাঁধা গণিতনির্ভর বিশ্লেষণী মানসিকতার পরিচয় দিতে লাগলেন।

হ্যালির স্বদেশ ইংলণ্ডে নয়, কিন্তু সাগরপারের প্রতিবেশী দেশ ফ্রান্সে এই বাঁধটা প্রথমে ভেঙ্গে পড়ল। যতই ১৭৫৮ সাল এগিয়ে আসতে লাগল ততই কাজের মাত্রা বেড়ে গেল। হ্যালির ধূমকেতু আবার আকাশে উঠবে, কে আগে হ্যালির ধূমকেতু দেখবেন, কে কতটা বাড়তি তথ্য সংগ্রহ করে ফেলবেন, এই নিয়েই বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। যেসব বিজ্ঞানী অগ্রগণ্য ছিলেন তাঁরা হলেন আলেক্সি ক্লোদ ক্লারিও (Alexis Claude Clariaut), জোসেফ জেরোম দ্য লালাঁদ (Joseph Jerome de Lalande), মাদাম জঁা আঁদ্রে ল্যপোত (Madame Jean Andre Lepaute) এবং শার্ল মেসিয়ে (Charles Messier)। ভলতেয়ার (Voltaire)[১] তো শতমুখে এঁদের প্রশংসা করে এই সময়টায় বলেছিলেন হ্যালির ধূমকেতু সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কাজে ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা এত দূর মগ্ন থাকতেন যে এঁদের আহার-নিদ্রা একরকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। গণিতবিদ লালাঁদ তাঁর রোজনামচায় লিখেই গিয়েছেন, "১৭৫৮ সাল

শুরু হওয়ার আগে থেকেই ছ-মাস ধরে সকাল থেকে রাত অবধি আমাদের গণনার কাজ চলত। কখনও কখনও খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে ফাঁকেই এই কাজ সেরে নিতে হত। এর ফলটা দাঁড়াল আমি রোগে পড়ে গেলাম এবং ভগ্নস্বাস্থ্যের এই মাশুল আমায় সারাটা জীবন ধরেই দিতে হয়েছিল।[২]"

কতকগুলো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এঁরা কাজে এগিয়ে চললেন। এঁরা চাইছিলেন হ্যালির ধূমকেতুর কক্ষপথের আকৃতি কেমন এটা নতুন করে যাচাই করা, হ্যালির ধূমকেতু বাস্তবিক ৭৬ বছর অন্তর সূর্যের কাছে একবার ঘুরে যায় কি না এর সত্যাসত্য জানা, হ্যালির ধূমকেতুর উপর অন্য কোন্ কোন্ গ্রহের কী ধরণের প্রভাব পড়ছে সেটাও নির্ণয় করা। এঁরা অঙ্ক কষে বলে দিলেন ১৫৩১ সাল থেকে ১৬০৭ সাল পর্যন্ত হ্যালির ধূমকেতুর সূর্যের নিকটবর্তী হতে একটু বেশী সময় লেগেছিল, আর ১৬০৭ থেকে ১৬৮২ সাল পর্যন্ত এই ধূমকেতু সূর্যের আকাশে আসতে একটু কম সময় নিয়েছিল। আসা-যাওয়ার সময়ের এই হেরফেরটা ছিল যথাক্রমে ২৭,৮১১ দিন এবং ২৭,৩২৫ দিন।

এঁদের মধ্যে বিজ্ঞানী ক্লারিওর বক্তব্য ছিল আবার বেশ অভিনব। তিনি বললেন ১৭৫৮ সালের কিছু পরে হ্যালির ধূমকেতু সূর্যের নিকটতম বিন্দু অর্থাৎ অনুসূর স্থানে এসে হাজির হবে। ৬১৮ দিনের মতন দেরী হয়ে যাবে। বৃহস্পতি তার আকর্ষণের দ্বারা ৫১৮ দিনের মতন ধূমকেতুটার চলার বিচ্যুতি ঘটাবে, আর শনির দ্বারা ১০০ দিন দেরী হয়ে যাবে। সেই হিসেবে তিনি ১৭৫৯ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ সূর্যের অনুসূর স্থানে হ্যালির ধূমকেতুর এসে পৌঁছবার কথা ঘোষণা করে রাখলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ৩২ দিনের মতো একটা সময়ের হিসেবও তুলে ধরলেন। ব্যাপারটা সম্বন্ধে তিনি বললেন গণনা করে যদি দেখা যায় ধূমকেতুটা ঘোষিত তারিখেও সূর্যের অনুসূরবিন্দুতে এসে হাজির হল না, ৩২ দিন আগে এসে হাজির হচ্ছে, তখন একটা কারণ বুঝতে হবে।

মনে করুন আজ আমরা জানতে পারলাম হ্যালির ধূমকেতু সূর্যের অনুসূর স্থানে এসে পৌঁছেছে। তারপর ৭৫ + ৭৫ বছর = ১৫০ বছর অর্থাৎ ধূমকেতুটার দুটো পরিক্রমণ শেষ হল। আজ থেকে এই ১৫০ বছর পার করার জন্য ধূমকেতুটা নির্দ্ধারিত দিনে সূর্যের অনুসূর বিন্দুতে নাও আসতে পারে। ৩২ দিনের মতন তখন একটা হিসেবের গরমিল দেখা দিতে পারে। বিজ্ঞানীরা পরবর্তীকালে ক্লারিওর এই কথার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চান নি। কিন্তু কার্যত দেখা গিয়েছিল ক্লারিওর ঘোষণা মতো হ্যালির ধূমকেতু ১৭৫৯ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ সূর্যের অনুসূর স্থানে হাজির না হয়ে ১৭৫৯ সালে ১৩ই মার্চ তারিখে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। অর্থাৎ ফারাকটা ছিল সেই মাত্র এক মাসের মতন।

এইভাবে বছরের পর বছর পার হতে লাগল, প্রথমে হ্যালির ধূমকেতু এবং তারপর সামগ্রিকভাবে অন্য ধূমকেতু সম্বন্ধেও বিজ্ঞানীরা তাঁদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে চললেন। ইতিমধ্যে একদিন ১৯১০
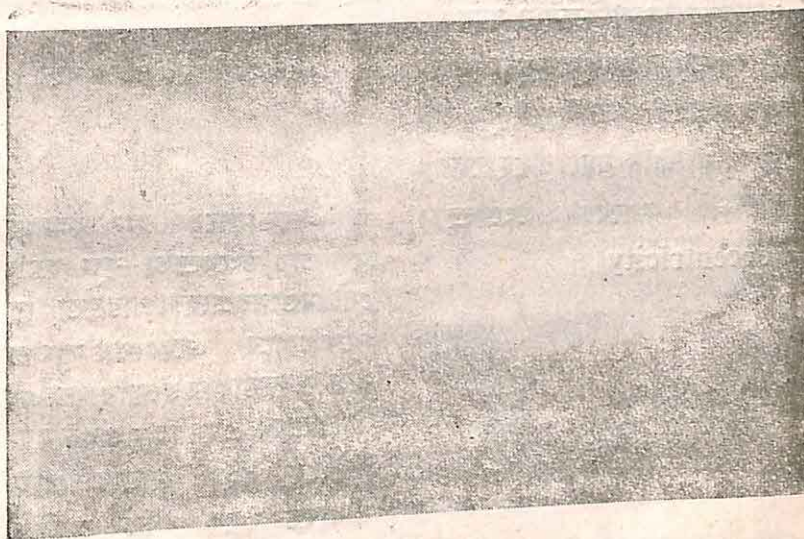
হ্যালির ধূমকেতুর মাথার অংশ

সাল এসে হাজির হল। আবার সেই হ্যালির ধূমকেতু আকাশে উঠল। ততদিনে দেখা গেল ধূমকেতুটা সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু

জেনে ফেলেছি। কিন্তু জানার তো আর শেষ নেই, এখনও অনেক কিছু আমাদের জানতে হবে। আপাতত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো একটু জেনে রাখা যাক।

* হ্যালির ধূমকেতুর আবিষ্কারক।	* অজ্ঞাত।
* লিখিত বিবরণের ভিত্তিতে হ্যালির ধূমকেতুকে প্রথম কখন দেখা গিয়েছিল?	* (ক) ভারতীয় জৈন গ্রন্থ কল্পসূত্র মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৬ সালে। সেখানে ধূমকেতুর নাম দেওয়া হয়েছে ভস্মরাশি গ্রহ। (খ) চৈনিক বিবরণ অনুসারে খ্রীষ্টপূর্ব ২৪০ সালে।
* হ্যালির ধূমকেতুর পরিক্রমণ-পথ।	* উৎকেন্দ্রযুক্ত অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ উপবৃত্তাকার।
* সাধারণভাবে হ্যালির ধূমকেতুর কক্ষপরিক্রমার সময়।	* ৭৬ বছর।
* হ্যালির ধূমকেতুর উপর অন্য গ্রহের প্রভাব হেতু তার আসা-যাওয়ার সময়ের হেরফের।	* ৭৪·৪ থেকে ৭৯·৩ বছর।
* কক্ষপথের উৎকেন্দ্রতা (eccentricity)।	* বৃত্তাকারে কোন কক্ষপথ হলে তার উৎকেন্দ্রতা শূন্য হয়। সৌরমণ্ডলের গ্রহেরা প্রায় বৃত্তাকার পথে ঘোরে। এদের পথ সামান্য মাত্র উপবৃত্তাকার হওয়ার জন্য এই উৎকেন্দ্রতা এমন কিছু প্রকট নয়। ০ থেকে ০·২৫ মাত্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু হ্যালির ধূমকেতুর কক্ষপথ এত দীর্ঘ উপবৃত্তাকার যে এর উৎকেন্দ্রতা খুব বেশী। ০·৯৭।

* হ্যালির ধূমকেতুর কক্ষ-পথের আনতি।

* হ্যালির ধূমকেতুর কক্ষপথ এবং পৃথিবীর কক্ষপথ একই সমতলে নেই। পৃথিবীর কক্ষের সমতলের সঙ্গে হ্যালির ধূমকেতুর পথ১৬২·২ ডিগ্রীতে আনত। এই ধরণের বিরাট কোণ সৃষ্টি করার ফলে হ্যালির ধূমকেতু পৃথিবীর গতির বিপরীতে ঘোরে।

* হ্যালির ধূমকেতু কোন্ মুখে ঘোরে এবং কেন?

* পৃথিবী তার নিজের অক্ষ-দণ্ডের উপর পশ্চিম থেকে পূবে ঘোরে। একে আমরা বলি সম্মুখ গতি বা Direct Motion অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার উলটো দিকে। কিন্তু হ্যালির ধূমকেতু ঘোরে পূব থেকে পশ্চিমে। একে আমরা বলি বিপরীত গতি বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় প্রতীপ গতি বা Retrograde Motion। যদি ধূমকেতুর কক্ষপথের আনতি 0° থেকে ৯০°-র থাকে মধ্যে তাহলে গ্রহদের মতন ধূমকেতুর সম্মুখ গতি হবে এবং যদি ধূমকেতুর কক্ষপথের আনতি ৯০° থেকে ১৮০°-র মধ্যে থাকে তাহলে ধূমকেতুর প্রতীপ গতি হবে। হ্যালির ধূমকেতুর কক্ষপথের আনতি ১৬২ ডিগ্রী হওয়ার জন্য তার প্রতীপ গতি হয়েছে।

* হ্যালির ধূমকেতু সূর্যের অনুসূর স্থানে থাকলে সূর্য থেকে তার দূরত্ব কত থাকে ?

* হ্যালির ধূমকেতু যখন বুধ এবং শুক্রের মাঝে থাকে তখন সূর্য থেকে এর নিকটতম দূরত্ব হয় ০.৫৯ জ্যোতিষীয় একক (জ্যোতিষীয় একক = Astronomical unit (AU) = পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব অর্থাৎ ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইলকে বলা হয় ১ জ্যোতিষীয় একক)।

* হ্যালির ধূমকেতু যখন সূর্য থেকে দূরতম বিন্দুতে (অপসূর = aphelion) অর্থাৎ নেপচুনের কাছে থাকে তখন সূর্য থেকে তার দূরত্ব কত হয় ?

* ৩৫·৩ জ্যোতিষীয় একক।

* হ্যালির ধূমকেতুকে সাধারণত কত দিন আকাশে দেখা যায় ?

* আনুমানিক ৪০ দিনের মতন। তবে ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালির ধূমকেতুকে প্রায় ৬৫ দিনের মতো দেখা গিয়েছিল।

* হ্যালির ধূমকেতু কোন্ শ্রেণীর ?

* স্বল্পমেয়াদী পর্যায়িক (Short-period), অর্থাৎ একটা সময়ের হিসেবে ৭৬ বছর অন্তর আকাশে আসে।

* ১৯১০ সালে হ্যালির ধূমকেতুর পুচ্ছদেশের সর্বাপেক্ষা দৈর্ঘ্য কত ছিল ?

* আনুমানিক ১০ কোটি কিলোমিটারের মতন।

* মস্তকভাগ বা head-এর ঘূর্ণনকাল।

* আনুমানিক ১০ ঘণ্টার সামান্য বেশী।

* মস্তকভাগের মধ্যকার কেন্দ্রীয় অংশ বা nucleus এর ব্যাসার্দ্ধ (radius) কত ?

* প্রায় ১৫ কিলোমিটার।

* কেন্দ্রীয় অংশের কোন চৌম্বকশক্তি আছে কি না ?

* এখনও পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে তাতে নেই বলেই মনে হয়।

* হ্যালির ধূমকেতুর মাথার অংশের তাপমাত্রা কত ?

* ধূমকেতুটা যখন সূর্য থেকে ১ জ্যোতিষীয় একক দূরত্বে (অর্থাৎ ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল অথবা $১'৪৯৫ \times ১০^{৮}$ কিলোমিটার) থাকে তখন এর মাথার অংশের তাপমাত্রা হয় ২০০° কেলভিন (কেলভিন ০° = সেন্টিগ্রেড—২৭৩° = ফারেনহাইট—৪৬০°)।

* হ্যালির ধূমকেতুর সূর্যের আলো প্রতিফলিত (albedo) করার ক্ষমতা কী রকম ?

* চাঁদের হিসেব দিয়ে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করার বিষয়টা অর্থাৎ albedo বোঝা যাক। চাঁদের albedo হল ০'০৭, অর্থাৎ চাঁদ সূর্যালোকের শতকরা ৭ ভাগ মাত্র (৭%) আলো প্রতিফলিত করতে পারে। হ্যালির ধূমকেতুর মাথার অংশটার সূর্যালোক প্রতিফলিত করার ক্ষমতা হল ০'০৪।

* কেন্দ্রীয় অংশের (nucleus) আকৃতিটা কেমন ?

* অনুমান করা হয়েছে নিটোল গোলাকার নয়।

* হ্যালির ধূমকেতুর গ্যাসীয় অংশের বস্তুমান কত ?

* প্রায় $৬'৫ \times ১০^{১৬}$ gm।

* পুচ্ছদেশের ঘনত্ব কেমন ?

* প্রায় ১gm/cm৩।

* হ্যালির ধূমকেতুর মস্তকভাগের গ্যাসীয় অংশটা কতটা পুরু অর্থাৎ এর প্রস্থ কী রকম ?

* আনুমানিক $১০^{৪}$ থেকে $১০^{৫}$ কিলোমিটার।

* হ্যালির ধূমকেতু তার কক্ষপথে ৭৬ বছর অন্তর একবার ঘুরে যায়। সূর্য থেকে নিকটতম

* ৩৮ বছর। সেই হিসেবে হ্যালির ধূমকেতু ১৯১০ সালে অনুসূর বিন্দুতে এসে পৌঁছেছিল

বিন্দু অর্থাৎ অনুসূর স্থান থেকে দূরতম বিন্দু অর্থাৎ অপসূর স্থানে গিয়ে পৌঁছতে তার কত সময় লাগে ?

এবং ১৯৪৮ সালে অপসূর বিন্দুতে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

* ১৯১০ সালে হ্যালির ধূমকেতুর পুচ্ছ দেশের মধ্য দিয়ে পৃথিবী চলে গিয়েছিল। তখন এর দ্বারা আমাদের পৃথিবীর কি কোনও রকম ক্ষতি হয়েছিল ?

* কিছুমাত্র নয়।

* হ্যালির ধূমকেতুকে ভবিষ্যতে আবার কবে দেখা যাবে ?

* ২০৬১-৬২ সালে।

* হ্যালির ধূমকেতুর সঙ্গে জড়িত উল্কা পাত।

* ৪ঠা মে (Eta Aquarid বা কুম্ভরাশি অঞ্চলে) এবং ২০শে অক্টোবর (Orionid বা কাল-পুরুষ অঞ্চলে) প্রতি বছর এই উল্কাপাতকে দেখা যায়।

পাদটীকা

১. ভলতেয়্যরের আসল নাম ছিল ফ্রাঁসোয়া মারী আরুয়ে (Francois Marie Arouet (১৬৯৪—১৭৭৮)। তিনি যখন লেখনী ধারণ করতেন তখন একটা ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। সেটা ছিল এই "ভলতেয়্যর ." অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রাঁসের বিদগ্ধ চিন্তাশীল সমাজের তিনি ছিলেন পুরোধা পুরুষ। ক্ষতিকারক প্রাচীন পন্থী সামাজিক মনোভাবের বিরুদ্ধে তিনি সব সময়েই লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। এর জন্য তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছিল। কাঁদিদ (Candide), L'essai sur les moeurs et l'espirit des nations (Essay on the Manners and Spirit of Nations) রচনার জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। বিজ্ঞানেও তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। ফ্রাঁসে নিউটনের অভিকর্ষবাদকে জনপ্রিয় করে তোলার মূলেও ছিলেন ভলতেয়্যর। নিউটনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে

তিনি Elements de la philosophie de Newton (Elements of the Newtonian Philosophy) নামে একখানা গ্রন্থও রচনা করে যান।

২. "During six months we calculated from morning to night, sometimes even at meals; the consequence of which was, that I contracted an illness which changed my constitution for the rest of my life," Memoire de Laland.

৭
আগামী দিনের হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে নানান পরীক্ষা

একথা অনস্বীকার্য যে হ্যালির ধূমকেতুর আলাদা একটা নামডাক আছে। ইদানিংকালে আমাদের দেখা ধূমকেতুদের মধ্যে এর তুল্য এত চমৎকার দেখতে, এত উজ্জ্বল, বিশালকায় ধূমকেতু নজরে পড়েনি। কিন্তু মুশকিল হল হ্যালির ধূমকেতুকে সহজে দেখা যায় না। আগেই আমরা আলোচনা করে নিয়েছি ৭৫-৭৬ বছরের মতন কাল গুণে বসে থাকলে তবে তাকে দেখার সৌভাগ্য হয়। ১৯১০ সালের পর বর্তমান বছরের একেবারে শেষ দিক থেকে আগামী বছরের গোড়ার কয়েক মাস পর্যন্ত এটি আবার আমাদের পৃথিবীর আকাশে এসে হাজির হচ্ছে। মানুষের কত আশা-আকাঙ্খা, দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষা পূর্ণ হতে চলেছে। বিজ্ঞানী মহলেও সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে। হ্যালির ধূমকেতু সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত আমরা যা জেনেছি সেই সব তথ্যের নতুন করে বিচার-বিশ্লেষণেরও যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনি যেসব তথ্য আজও অজানা থেকে গিয়েছে সেগুলোকেও জ্ঞানের আলোকে নিয়ে আসা দরকার।

বিজ্ঞান আজ বহু দূর এগিয়ে গিয়েছে। আজ আমরা অতি শক্তিশালী দূরবীণযন্ত্র ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছি, বেতার-দূরবীণও আমাদের যথেষ্ট কাজে আসতে পারে, লেজার রশ্মি (Laser Ray) প্রয়োগের দ্বারাও আমাদের কাজ চলতে পারে, ঘনত্ব মাপার স্পেক্টোমিটারও আমাদের রয়েছে। এই সব যন্ত্রানুষঙ্গের মাধ্যমে আগামী দিনের হ্যালির ধূমকেতু সম্বন্ধে আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ আরও উন্নততর পর্যায়ের হতে পারবে বলে আমরা

নিশ্চয়ই আশা করতে পারি। কয়েক বছর আগে ১৯৭৭ সাল থেকেই দূরবীনের সাহায্যে হ্যালির ধূমকেতুকে খুঁজে পাওয়ার অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা আকাশ-পর্যবেক্ষক, বিশেষ করে যাঁরা ধূমকেতু-পর্যবেক্ষক, বলতে গেলে তাঁদের প্রচণ্ড পরিশ্রম এবং ধৈর্যের চরম পরীক্ষায় বসতে হয়। হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে যাঁরা কাজে নেমেছেন অতন্দ্র প্রহরীর মতো তাঁরা শক্তিশালী দূরবীণে চোখ রেখে ধূমকেতুর গতিপথের উপর শ্যেনদৃষ্টি রেখে চলেছেন। ইতিমধ্যেই দু'জন বিজ্ঞানী নাম করে ফেলেছেন। এঁরা দু'জনেই মার্কিন দেশের মানুষ। নাম ডেভিড জেউইট (David Jewitt) এবং এডওয়ার্ড ড্যানিয়েলসন (Edward Danielson)[১]। ১৯৮২ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখে যখন কাকভোর হয়ে আসছে তখনই
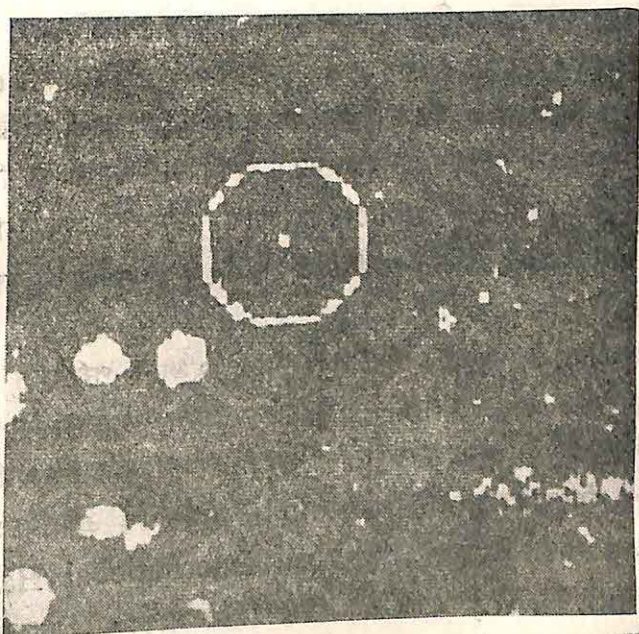
১৯৮২ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখে জেউইট এবং ড্যানিয়েলসনের তোলা হ্যালির ধূমকেতুর ছবি।

জেউইট এবং ড্যানিয়েলসন মাউণ্ট প্যালোমার মানমন্দিরের ৫°১ মিটার দূরবীনের সঙ্গে যুক্ত ইলেকট্রনিক ক্যামেরার সাহায্যে প্রথম হ্যালির ধূমকেতুর আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন। কালপুরুষ তারামণ্ডলের পিছনে ছোট কুকুর (Canis Minor) অঞ্চলে। পৃথিবী থেকে ধূমকেতুটার তখন দূরত্ব ছিল ১৬০ কোটি কিলোমিটার, ইউরেনাসের পরিক্রমণপথ পার করে সে তখন প্রায় শনির কাছাকাছি চলে এসেছে। ওই অত দূরে ধূমকেতুটার তখন লেজও গজায় নি, মাথার ভাগটাও বড় দেখায় নি, উজ্জ্বলও হয়ে ওঠেনি। শুধুই দেখা গেল আকাশের বুকে এতটুকু এক আলোর ফোঁটা ফুটে উঠেছে। ৫১ পৃষ্ঠার ছবিটা লক্ষ্য করুন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আগে থেকে গাণিতিক হিসেবনিকেশ করে বলে রেখেছিলেন হ্যালির ধূমকেতু সূর্যের সবচেয়ে কাছে এসে পৌঁছবে আগামী ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৯ তারিখে। প্যালোমারের দূরবীণ দিয়ে বিজ্ঞানীরা ১৯৮২ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখে হ্যালির ধূমকেতুকে আকাশের ঠিক যে-অবস্থানে দেখতে পেয়েছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে ধূমকেতুটার পথ এবং গতিবেগ পর্যালোচনা করে দেখা হয়েছে। জানতে পারা যাচ্ছে ১৯৮৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সঙ্গে ধূমকেতুটার বর্তমান অবস্থানের হিসেবটা চমৎকার মিলে যাচ্ছে। এর ভিত্তিতে আমাদের আশাও জোরদার হচ্ছে তাহলে ১৯৮৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখেই হ্যালির ধূমকেতু সূর্যের অনুসূর স্থানে এসে হাজির হচ্ছে।

পৃথিবীব্যাপী হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে যেভাবে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার কাজ এগিয়ে চলছে এর ভিত্তিতে যেসব তথ্য পাওয়া যাবে তার বিশ্লেষণ এবং সমন্বয় দরকার। তা না হলে বিরাট এই কর্মযজ্ঞে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। অনাবশ্যক এই বিড়ম্বনার হাত এড়ানোর উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা International Halley Watch (I. H. W.)[২] নামে এক আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে তুলেছেন। পৃথিবীর যেখানে যত মানমন্দির আছে সেখানকার বিজ্ঞানীরা

অথবা সখের ধূমকেতু-পর্যবেক্ষকরা কে কীভাবে হ্যালির ধূমকেতুকে দেখতে পেলেন, কী নতুন তথ্য সংগ্রহ করলেন, অন্যান্য ধূমকেতু সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে হ্যালির ধূমকেতুর তুলনাত্মক আলোচনা করে কী মিল-গরমিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, এই সব কিছু কাজকে উৎসাহ দেওয়া এবং সমন্বয় স্থাপন করাই হল "আন্তর্জাতিক হ্যালি পর্যবেক্ষণের" (I.H.W.) উদ্দেশ্য। ছ'ধরণের কর্মসূচী এঁরা নিয়েছেন। যেমন,—

(১) খগোলমিতি (Astrometry)
(২) অবলোহিত বর্ণালীবীক্ষণ (Infrared spectroscopy) এবং বেতারমিতি (Radiometry)
(৩) বৃহৎ কোন পরিঘটনা (Large-scale phenomenon)
(৪) কাছ থেকে ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ বা nucleus অধ্যয়ন
(৫) বেতার-বিজ্ঞান (Radio Science)
(৬) প্রকাশমিতি (Photometry) এবং ধ্রুবীয়মিতি (Polarometry)
(৭) বর্ণালীবীক্ষণ (Spectroscopy) এবং বর্ণালীপ্রকাশমিতি (Spectrophotometry)

এইসব কাজকর্মের সঙ্গে আর একটা বিরাট প্রকল্প যুক্ত হয়েছে। ১৯১০ সালে হ্যালির ধূমকেতু যখন আকাশে উঠেছিল তখন বিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্ত্বেও একটা বিষয়ে আমরা সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত ছিলাম। তখন মহাকাশযান আকাশে উৎক্ষেপ করার কথা ভাবা যেত না। কিন্তু এ বিষয়টা আজ আমাদের হাতের মুঠোয় এবং বলা বাহুল্য মহাকাশযান মহাকাশ সম্বন্ধে যেভাবে নির্ভরযোগ্য তথ্য উপহার দিতে পারে এই ধরণের কাজ পৃথিবীতে বসে সম্ভব হয় না। এই জন্যই বিজ্ঞানীরা আগামী দিনে হ্যালির ধূমকেতু যখন আকাশে উঠবে তখন সেই ধূমকেতু অভিমুখে মহাকাশযান পাঠানোরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা চার ধরণের প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। যেমন, গিয়োত্তো (Giotto) মিশন, ভেগা (Vega) মহাকাশযান (দু-ধরণের)

এবং প্লানেট-এ (Planet-A) মহাকাশযান। ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি (ESA) গিয়োত্তো (Giotto) নামে মহাকাশযান পাঠাবার পরিকল্পনা নিয়েছেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ভেগা (Vega) প্রকল্পের অন্তর্গত দুটি আলাদা আলাদা মহাকাশযান পাঠানো হবে, আর জাপানের বিজ্ঞানীরা প্লানেট-এ (Planet-A) নামে মহাকাশযান উৎক্ষেপ করবেন।
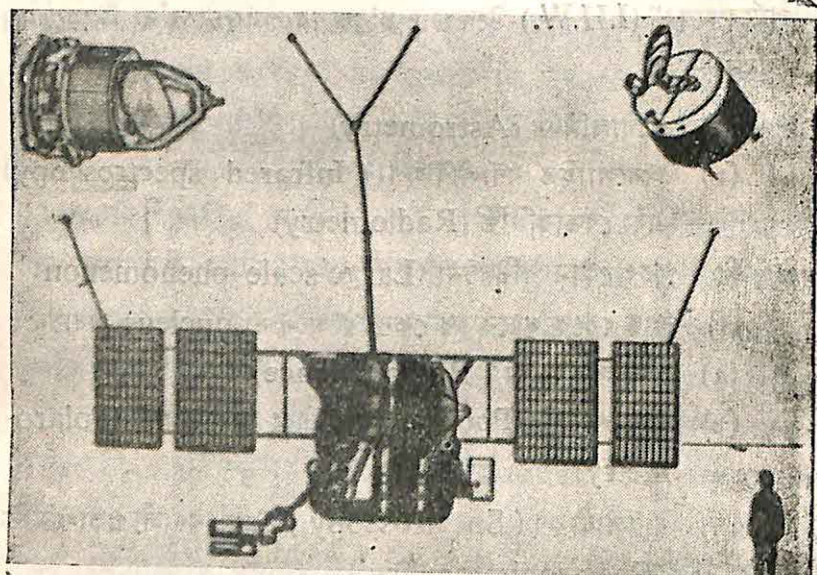
হ্যালির ধূমকেতু অভিমুখে মহাকাশযান
উপর বাঁদিকে : গিয়োত্তো মহাকাশযান, উপর ডানদিকে : প্লানেট-এ
নিচে : ভেগা মহাকাশযান

এই সব মহাকাশযান কী ধরণের কাজ করবে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা তুলে ধরলাম।

(১) গিয়োত্তো মহাকাশযান : মহাকাশযানটি আকারে খুবই ছোট, অনেকটা যেন সিলিণ্ডারের মতন দেখতে এবং এর ব্যাস হল ১·৮ মিটার, আর উচ্চতায় ৩ মিটার। যদি পরিকল্পনা অনুসারে সব কিছু ভালয় ভালয় এগিয়ে চলে তাহলে বর্তমান বছরের ১০ই

জুলাই তারিখে একে আকাশে ছাড়ার কথা। প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৬৮ কিলোমিটার গতিবেগে এটি এগিয়ে চলবে এবং আগামী বছরের ১৩/১৪ মার্চ তারিখে ধূমকেতুটার গ্যাসীয় আবরণ তথা পুচ্ছদেশের মধ্যে সরাসরি প্রবেশ করবে এবং ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ বা nucleus থেকে ৫০০ কিলোমিটারের মতন দূরত্ব চলে আসবে। প্রায় চার ঘণ্টার মতন সময় নিয়ে কেন্দ্রীয় অংশের গাঠনিক আকৃতি, এর বস্তুমান, এর ঘূর্ণন ইত্যাদি সম্বন্ধে পরীক্ষা চালানোর কথা ভেবে রাখা হয়েছে। এছাড়া গ্যাসীয় আবরণ এবং লেজের অন্তর্গত বস্তুকণার আকার নিয়েও অনুসন্ধান চালানো হবে; আর প্লাজমা লেজ* যে কীভাবে গড়ে উঠেছে বা কাজ করছে সেটা জানারও চেষ্টা করা হবে। ধূমকেতুর লেজের অংশ থেকে কী অনুপাতে বস্তুকণা নির্গত হচ্ছে সেটা জানাও গিয়োত্তো মহাকাশযানের মুখ্য কাজ হবে।

(২) সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা তুলনামূলকভাবে একটু বড় রকমের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ভেগা প্রকল্পের অন্তর্গত তুটি মহা-কাশযান ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে তুই-এক সপ্তাহের ব্যবধানে পৃথক পৃথক যাত্রা করবে। কিন্তু তুটি মহাকাশযানই শুক্রগ্রহ হয়ে হ্যালির ধূমকেতুর দিকে পাড়ি জমাবে। যেহেতু হ্যালির ধূমকেতু সূর্যের চারদিকে বুধ এবং শুক্রের মাঝ দিয়ে বেড় দেয় অতএব এই অবসরে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা শুক্র সম্বন্ধেও কিছু তথ্য সংগ্রহ করে ফেলতে চাইছেন। পৃথিবী থেকে শুক্রের কাছে আসতে ভেগা মিশনের তুটি মহাকাশযানেরই যথাক্রমে ১৭৪ এবং ১৭৬ দিন সময় লেগে যাবে। তারপর প্যারাশুটের সাহায্যে ধীরে ধীরে শুক্রপৃষ্ঠে অবতরণ করবে এবং শুক্রের তাপমাত্রা এবং বায়ুমণ্ডলের চাপ এবং তার প্রকৃতি জানার কাজ চালিয়ে যাবে। এইভাবে শুক্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ শেষ করে এরা হ্যালির ধূমকেতু অভিমুখে অগ্রসর হবে। ১৯৮৬ সালের ৮ই মার্চ তারিখে প্রথম ভেগা মহাকাশযানটি ধূমকেতুর কাছে এসে

*পরে, ধূমকেতুর লেজ অধ্যায়ে, প্লাজমা লেজ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলব।

পৌঁছবে। তার অল্প কয়েকদিন পরেই দ্বিতীয় ভেগা মহাকাশযান সেখানে এসে হাজির হবে। ধূমকেতুটা থেকে তখন এদের ন্যূনতম দূরত্ব হবে ১০,০০০ কিলোমিটার এবং গতিবেগ থাকবে প্রতি সেকেণ্ডে ৭৮ কিলোমিটার। লক্ষ্যণীয় যে গিয়োত্তো মহাকাশযানের চেয়ে এর গতিবেগ একটু বেশীই থাকবে। মার্চ মাসের ৬ তারিখ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত ধূমকেতুর পুচ্ছদেশের মধ্য দিয়ে মহাকাশযানটির অতিক্রমণ চলবে। মহাকাশযানের মধ্যে ক্যামেরা, স্পেক্ট্রোমিটার ইত্যাদি যন্ত্র সাজানো থাকবে। ধূমকেতু থেকে প্রতিফলিত আলোর তীব্রতা এবং ধূমকেতুর গ্যাসীয় চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা চালানো হবে।

(৩) জাপানী বিজ্ঞানীরাও তাঁদের প্রকল্পকে দু-ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। এক হল প্রাথমিক MS-T5 মহাকাশযান এবং এরই পরিপূরক আসল প্লানেট-এ মহাকাশযান। কিন্তু MS-T5 ধূমকেতুর কাছে গিয়ে পৌঁছবে না। এর মুখ্য কাজ হবে আন্তর্গ্রহ পরিমণ্ডলের অবস্থা খতিয়ে দেখা। প্লানেট-এ মহাকাশযানকে অনেকটা ড্রামের মতন দেখতে এবং এর ব্যাস হল ১·৪ মিটার, আর উচ্চতায় ০·৭ মিটার। একে আকাশে উৎক্ষেপ করার কথা ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে। সৌরঝড়ের সঙ্গে ধূমকেতুর সম্পর্ক এবং ধূমকেতুর চারদিকে হাইড্রোজেন গ্যাসের মেঘের মতন আচ্ছাদন কেনই বা গড়ে ওঠে, এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। ধূমকেতু থেকে ২০,০০০ কিলোমিটারের মতন দূরত্বে ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে প্লানেট-এ পৌঁছতে পারে বলে আশা করা যাচ্ছে।

মহাকাশযানের মাধ্যমে ধূমকেতু সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কাজকে বিজ্ঞানীরা আরও কিছু দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন, অর্থাৎ এঁদের ইচ্ছে সূর্যের কাছ থেকে হ্যালির ধূমকেতু বিদায় নেওয়ার পরও কাজের যেন সেখানেই ইতি না হয়, ভেগা প্রকল্পের যে কোনও একটি মহাকাশযান হ্যালির ধূমকেতুকে আরও যেন তিন বছর

অনুসরণ করতে পারে। এই সময়ের মধ্যে হ্যালির ধূমকেতু সূর্য থেকে যত দূরে সরে যাবে তখন তার মধ্যে আরও কিছু পরিবর্তনের চিহ্ন ফুটে উঠবে। সে সম্বন্ধেও পাকা খবর পাওয়া দরকার। তারপর আর এক ধূমকেতু অভিমুখেও মহাকাশযান যাত্রা করতে পারে। সেটা হল টেম্পল-২ ধূমকেতু। হ্যালির ধূমকেতুর সঙ্গে দর্শনীয়তার বিচারে একে কোন গুরুত্বই দেওয়া চলে না। খুবই ছোট আকারের, তবে ঘন ঘনই সূর্যের কাছে আসে, ৫·৩ বছর অন্তর। ১৯৮৮ সালে আবার তার সূর্যের কাছে আসার কথা। বিজ্ঞানীরা চাইছেন টেম্পল-২-কে বছর খানেকের মতনও যেন অনুসরণ করা সম্ভব হয়। এদিকে গত বছর, অর্থাৎ ১৯৮৪ সালে, দৃষ্ট ছুটো ধূমকেতু (Encke's Comet) এবং ক্রোমোলিন ধূমকেতু (Crommelin's Comet) সম্বন্ধেও বিজ্ঞানীরা নানান রকমের তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছেন। এইভাবে বিজ্ঞানীরা একটা লক্ষ্যে পৌঁছতে চাইছেন যে ধূমকেতু সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণাকে তুলনাত্মক স্তরে নিয়ে যাওয়া হক। তুলনামূলক পদ্ধতিতে কাজের মূল্য অপরিসীম। এতে সুফল পাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। দেখা যাক বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা কত দূর ফলবতী হয়।

হ্যালির ধূমকেতুর আগমনকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে-চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে, যে-কর্মযজ্ঞ চলেছে, প্রশ্ন হতে পারে সেখানে আমাদের দেশের কি কোন ভূমিকা নেই ? নিশ্চয়ই আছে, আনন্দের কথা ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। আমাদের দেশ আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থার সদস্য এবং সেই হিসেবে ভারতবর্ষও তার এক নিজস্ব কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। যদিও হতে পারে বিদেশের তুলনায় আমাদের কাজের ব্যাপ্তি এবং গভীরতা তত বেশী নয়।

তথাপি ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এ্যাস্ট্রোফিজিকস, নৈনিতালে অবস্থিত উত্তরপ্রদেশ রাষ্ট্রীয় মানমন্দির, হায়দ্রাবাদের জাপাল-রাঙ্গাপুর মানমন্দির, বোম্বের টাটা ইনস্টিটিউট অব

ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ এবং কলকাতার পজিশনাল এ্যাস্ট্রনমি সেণ্টার দূরবীন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে হ্যালির ধূমকেতুর গাঠনিক প্রকৃতি, গ্যাসীয় আবরণের রাসায়নিক বিচার, চৌম্বক ক্ষেত্রের (যদি তেমন কিছু থাকে) পরিমাপন ইত্যাদির সম্বন্ধে সম্ভাব্য সব রকম পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহ করতে বদ্ধপরিকর।

পাদটীকা

১. ড্যানিয়েলসন এখনও স্নাতক পর্যায়ের ছাত্র। কিন্তু তাঁর কাজের উৎসাহটা লক্ষ্য করুন।

২. ১৯৭৯ সালে পাসাডোনার (ক্যালিফোর্নিয়া) জেট প্রপালসান ল্যাবরেটরির লুইস ফ্রিডম্যানের International Halley Watch নামে একটা সংস্থা স্থাপনের পরিকল্পনা মাথায় এসেছিল। পরে নাসা (NASA = National Aeronautics and Space Admimistration) এর সমর্থনে এগিয়ে আসে। ১৯৮১ সালের আগস্ট মাসে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা সংস্থার (International Astronomical Union = I.A.U.) কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক উপরোক্ত I.H.W. স্বীকৃত পায়। দুটি প্রধান দপ্তরের মাধ্যমে এর কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে। পশ্চিম গোলার্দ্ধের কাজকর্ম দেখার জন্য একটা দপ্তর বসেছে রে নিউবার্গের নেতৃত্বে ক্যালিফোর্ণিয়ার জেট প্রপালসান ল্যাবরেটরিতে, আর পূর্ব গোলার্দ্ধের কাজ-কর্ম দেখার জন্য যুরগেন রাহের নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মানির বামবার্গে (Bamberg) দপ্তর স্থাপিত হয়েছে।

ইংরেজী The Telegraph (১৬-৬-৮৫) সংবাদ পত্রে প্রকাশিত :

Soviet Probe on Venus

Moscow, June 15 (AP) : A second Soviet space probe landed on Venus and began analysing soil samples, the official news agency, Tass, reported.

Tass said the probe was released by the Vega 2 unmanned spacecraft. It is following a companion space vehicle, Vega 1, to a rendezvous with Halley's comet next year.

The module released by Vega 2 descended by parachute toward Venus.

আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৪-৯-৮৫) প্রকাশিত খবর :

বাঙ্গালোর, ১৩ সেপ্টেম্বর—আজ ভোর তিনটেয় পূব আকাশে মিথুন ও বৃষরাশির পটভূমিকায় হ্যালির ধূমকেতু দেখা দিয়েছে। পৃথিবী থেকে ৪৩ কোটি কিলোমিটার দূরে ছোট্ট একটি ব্যাঙাচি যেন। তাকে দেখা গেছে দূরবীনের চোখে। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের (আই আই এ) কাভালুর মানমন্দির থেকে এক মিটার ব্যাসের দূরবীনে আজ তার ছবি তোলা হয়েছে দুবার। আই আই এ-র অধ্যাপক ভারতীয় হ্যালি পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির চেয়ারম্যান কে আর শিবরামন বলেন, হ্যালির ধূমকেতু এখন রয়েছে বৃহস্পতি ও মঙ্গলের কক্ষপথের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব এখন ৪ কোটি ৩০ লক্ষ কিলোমিটার। ধূমকেতুটিকে খালি চোখে দেখা যাবে আগামী জানুয়ারিতে। ছোট দূরবীন এবং বাইনোকুলারে হ্যালি ধরা দেবে আগামী ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত। কেবল ফেব্রুয়ারি বাদ, কেননা ধূমকেতুটি ওইসময় সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকবে। ১৯৮৬-এর ১১ এপ্রিল হ্যালি চলে আসবে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে—৯ কোটি ২৭ লক্ষ কিমি দূরত্বে। ৭৬ বছর অন্তর পৃথিবীর আকাশে এই ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়।

৮

হ্যালির ধূমকেতুকে আমারা কিভাবে দেখব

দিন যতই এগিয়ে আসছে হ্যালির ধূমকেতু সম্বন্ধে আমাদের যেমন আগ্রহ বাড়ছে, সত্যি কথা বলতে কি আমাদের তেমনি একটু ভাবনাও বেড়েছে। বলা হচ্ছে হ্যালির ধূমকেতু বর্তমান বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকে আগামী বছরে এপ্রিল-মে নাগাদ পৃথিবীর আকাশে থাকবে এবং তখন তাকে দেখা যাবে। তবু আমাদের প্রশ্ন হ্যালির ধূমকেতুকে ঠিক কোন্ কোন্ সময় এবং কীভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করব।

একটা কথা আমরা বিলক্ষণ বুঝি যে ধূমকেতু দেখার বাধা অনেক। ধূমকেতুর অবস্থানগত নানা নিয়মকানুনের সঙ্গে দেখার ব্যাপারটা জড়িয়ে থাকে। বলার অপেক্ষা করে না ধূমকেতু আলোর ঝলকানি দিয়ে আকাশে ওঠে না। এমন কি গ্রহ-নক্ষত্রের মতন তাকে উজ্জ্বল আলোকবিন্দুও মনে হয় না। ধূমকেতু শুধুই একটু মোলায়েম পাঁশুটে রংয়ের দীপ্তি লেজের আকারে আকাশে ছড়িয়ে দেয়। খুব বড় ধূমকেতু হলে তার কথা অবশ্য একটু স্বতন্ত্র। দেখতে তাকে ভালই লাগে। হ্যালির ধূমকেতু খুব বড় আকারেরই ধূমকেতু এবং তাকে ভালভাবেই দেখার কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানীরা একটা সতর্কবাণীও উচ্চারণ করে রেখেছেন। ১৯১০ সালে হ্যালির ধূমকেতুকে আমরা যত চমৎকার দেখছিলাম এবারে নাকি তাকে ঠিক সেভাবে দেখতে পাওয়া যাবে না। হতাশ আমাদের একটু হতেই হবে।

যাই হক, হ্যালির ধূমকেতুকে দেখার সময় আমাদের কী কী বাধার সম্মুখীন হতে হবে সেগুলো এখন একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক।

প্রথম কথা নিকষ কাল আকাশপটে সারা রাত ধরে প্রাণ খুলে ধূমকেতু দেখার বাসনা আমরা করতে পারি না। বুধ এবং শুক্র গ্রহকে যেভাবে আমরা আকাশে দেখি ঠিক সেইভাবেই ধূমকেতূকে দেখতে হবে। হঠাৎ সূর্যাস্তের পর গোধূলি পার হয়ে সন্ধ্যারাত্রির ফিকে অন্ধকার আকাশে অথবা আরও একটু সময় পার করে। আর না হয়তো ভোরের আলো ফোটার অল্প আগে থেকে শুরু করে তাকে দেখতে হবে। এর কারণটা আমরা জানি যে বুধ এবং শুক্র পৃথিবী এবং সূর্যের মাঝে আছে এবং এই জন্যই এদের বলা হয় অন্তর্গ্রহ বা inferior planets। সেই হিসেবে এরা সূর্যের কাছেও আছে। হ্যালির ধূমকেতুরও একটা প্রান্ত সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝ দিয়ে (অন্য হিসেবে প্রকৃতপক্ষে বুধ এবং শুক্রের মাঝে) চলে গিয়েছে। এক্ষেত্রে তাহলে হ্যালির ধূমকেতুও সূর্যের খুবই কাছে চলে আসে। বুধ-শুক্রকে মাঝ আকাশে কখনও দেখা যায় না।
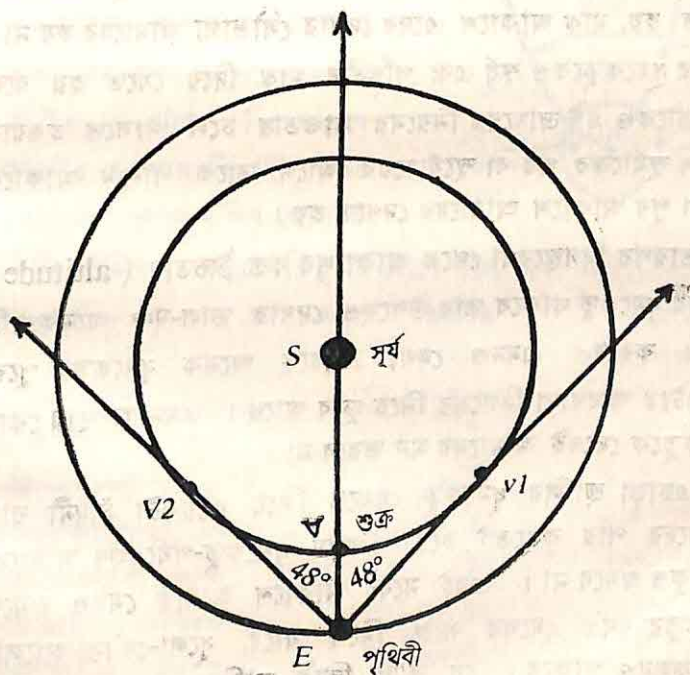
অনুরূপভাবে হ্যালির ধূমকেতুকেও মাঝ আকাশে আমরা দেখার আশা

করতে পারি না। কেন এমনটা হয় এর কারণ ৬০ পৃষ্ঠার ছবির সাহায্যে বোঝা যাক। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হ্যালির ধূমকেতুকেও কেন আমাদের সূর্যাস্তের পর এবং সূর্যোদয়ের আগে দেখতে হবে তার কারণটা অনুধাবন করে নেওয়া সহজ হবে।

E অর্থাৎ পৃথিবী থেকে শুক্র-কক্ষপথবৃত্তে EV_1 এবং EV_2 কে বলা হয় স্পর্শরেখা বা Tangent। অতএব SEV_1 এবং SEV_2 কোণকে বলা যেতে পারে সূর্য থেকে শুক্রের দ্রাঘণ বা elongation। এই দ্রাঘণ যদি সব চেয়ে বেশী হয় তাহলে ৪৮°-এর বেশী হবে না। আরও ভেঙ্গে বললে বলতে হয় শুক্রকে সূর্য থেকে কখনই ৪৮°-র বেশী কৌণিক দূরত্বে দেখা যাবে না। বুধের ক্ষেত্রে এই দ্রাঘণের সব চেয়ে অধিক মান হল ২৮°। কৌণিক দূরত্ব বা দ্রাঘণের এই নিয়মের জন্যই বুধ-শুক্রকে আমাদের পশ্চিম অথবা পূর্ব আকাশে দেখতে হয়, মাঝ আকাশে এদের দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয় না। হ্যালির ধূমকেতুকেও সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝ দিয়ে যেতে হয় বলে এবং তাকেও এই দ্রাঘণের নিয়মের আওতায় চলে আসতে হওয়ার কারণে সূর্যাস্তের পর বা সূর্যোদয়ের আগে তাকে পশ্চিম আকাশে কিংবা পূব আকাশে আমাদের দেখতে হয়।

তারপর দিগন্তরেখা থেকে আকাশের কত উচ্চতায় (altitude) হ্যালির ধূমকেতু থাকবে তার উপরেও দেখার ভাল-মন্দ অনেকখানি নির্ভর করবে। এমনও দেখা গিয়েছে অনেক ধূমকেতুর পুরো শরীরটার আধখানা দিগন্তের নিচে ডুবে আছে। এমন অবস্থায় কোন ধূমকেতুকে দেখেই আমাদের মন ভরবে না।

এছাড়া হ্যালির ধূমকেতু দেখতে গিয়ে কয়েকটা চাঁদনী রাত আমাদের পার করতেই হবে। তখন ধূমকেতু-পর্যবেক্ষণ আমাদের এতটুকুও জমবে না। এরই মধ্যে আকাশে আবার মেঘও জমবে, ধূমকেতুর বর্ণও মেঘের সঙ্গে মিশে যাবে, ধুলো-ধোঁয়া-আলোর প্রতিফলনও থাকবে। যে ক'টা দিনই হ্যালির ধূমকেতু আকাশে থাকবে এমনিভাবে বেশ কিছু দিনই নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু উপায় নেই, এরই মধ্যে আমাদের কাজ সেরে নিতে হবে।

প্রাথমিক এই সব কথাগুলো মনে রেখে হ্যালির ধূমকেতুকে দেখার কাজে আমরা ব্রতী হব।

এই ধূমকেতু কী ধরণের পথ ধরে সূর্য-পরিক্রমা করে আগে তার ছবিটা একটু দেখে নেওয়া যাক। এর ভিত্তিতে আগামী দিনে আকাশের কোন্ কোন্ অবস্থানে হ্যালির ধূমকেতুকে দেখতে পাওয়া যাবে সেটা আমরা বিবৃত করব।

এবার আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠের কোন্ কোন্ অক্ষাংশ থেকে এবং আকাশের কত উচ্চতায় হ্যালির ধূমকেতুকে দেখতে পাব তার একটা ছক পেশ করলাম। একটা জিনিস এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে আগামী দিন উত্তর গোলার্দ্ধ অপেক্ষা দক্ষিণ গোলার্দ্ধ থেকে হ্যালির ধূমকেতুকে কিছু পরিমাণে ভাল দেখা যাবে।
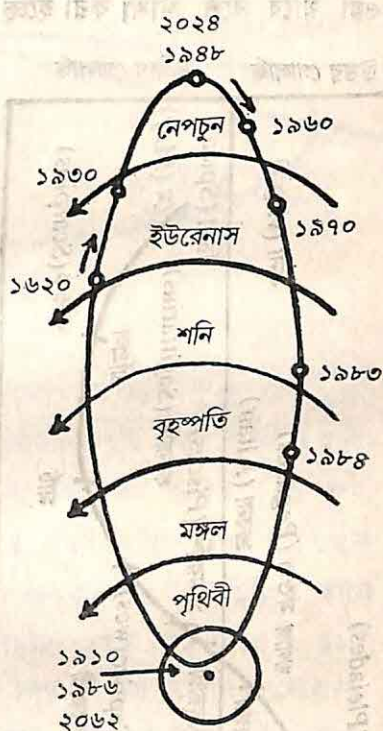
তারিখ	সময়	স্থানের অক্ষাংশ	Altitude বা আকাশের উচ্চতা
২৭শে নভেম্বর ১৯৮৫	সন্ধ্যা	০°	৩০°
১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৫	”	৫ উঃ	৮৫°
৫ই জানুয়ারী ১৯৮৬	”	১৫ উঃ	৫০°
২৫শে জানুয়ারী ১৯৮৬	”	৩৫ উঃ	২০°
১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬	ভোর	৫ উঃ	১৫°
৬ই মার্চ ১৯৮৬	”	২০ দঃ	৪০°
২৬শে মার্চ ১৯৮৬	”	৩০ দঃ	৮০°
১০ই এপ্রিল ১৯৮৬	”	৫৫ দঃ	৪৫°
৫ই মে ১৯৮৬	”	১০ দঃ	৬০°

উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধের কোন্ কোন্ তারামণ্ডল (constellation) এবং নক্ষত্রের কাছে আগামী দিনে হ্যালির ধূমকেতুকে দেখতে পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে সেটা নিচে লক্ষ্য করুন। এত
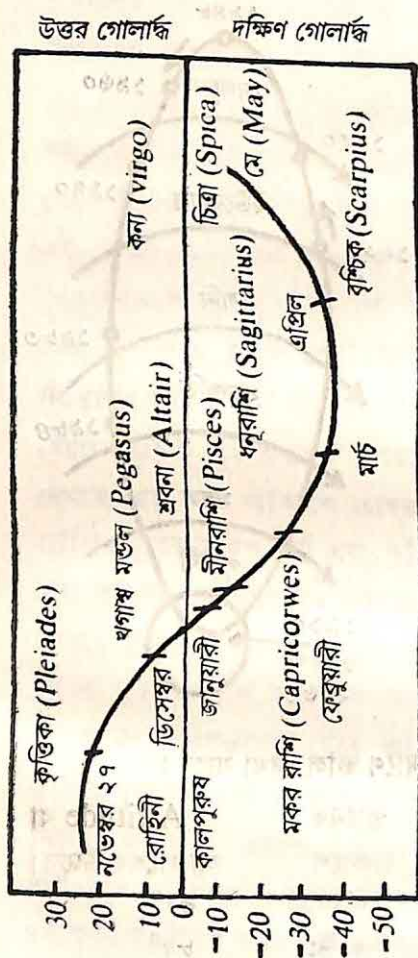
গণনা সত্ত্বেও হ্যালির ধূমকেতু দেখতে গিয়ে যদি কার্যক্ষেত্রে এমনটা দেখা যায় যে হ্যালির ধূমকেতু ঠিক ঠিক সময়ক্ষণ এবং আকাশে তার নিখুঁত অবস্থিতি মানছে না তাহলেও আমরা যেন তেমন আশ্চর্য না হই। উদাহরণস্বরূপ, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, গ্রহ-সম্মিলন ইত্যাদি জ্যোতিষ্কীয় ঘটনাগুলো সম্পর্কে দিনক্ষণের মধ্যে গণনার একটা নির্ভুলতা প্রমাণ করা যায়, কিন্তু ধূমকেতুর ক্ষেত্রে এই ধরণের নির্ভুল গণনা করা সব সময় সম্ভব হয় না। বিজ্ঞানীরা যা বলছেন তার একটু আধটু এদিক-ওদিক হয়ে যেতে পারে। এখানে কিন্তু বিজ্ঞানীদের এমন কোন দোষ নেই ; ধূমকেতুর অদ্ভুত আচরণের জন্যই অনেক সময় এমনটা হয়ে থাকে।

এখন, আসুন, পরের পাতার ছবিটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।
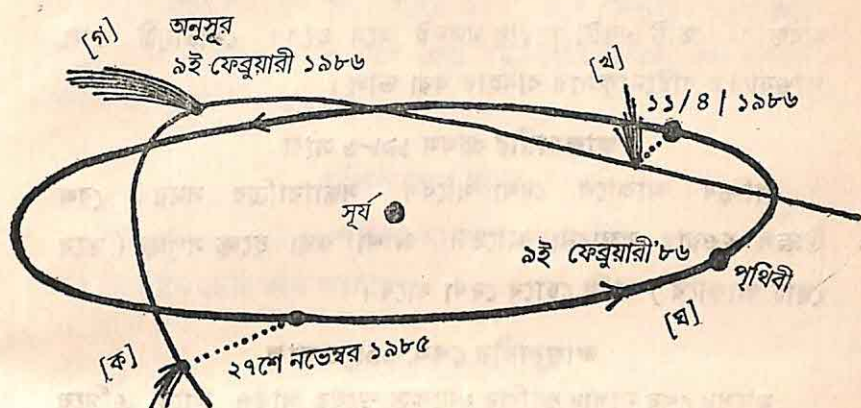
"ক" চিহ্নিত স্থানে পৃথিবী এবং ধূমকেতুর মধ্যে দূরত্ব হল ০·৬২ জ্যোতির্ষীয় একক (১ জ্যোতিষীয় একক = সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব) কিন্তু "খ" চিহ্নিত স্থানে, মেপে দেখুন, এই দূরত্ব আরও কিছু কম, ০·৪২ জ্যোতিষীয় একক। আবার, "ক" চিহ্নিত স্থানে সূর্য থেকে ধূমকেতুর দূরত্ব হল ১.৫৫ জ্যোতিষীয় একক, কিন্তু "খ" চিহ্নিত স্থানে ধূমকেতু সূর্য থেকে ১·৩৩ জ্যোতিষীয় একক দূরে আছে। ১১ই এপ্রিল "খ" চিহ্নিত স্থানে ধূমকেতুব লেজ বিশাল হয়ে দেখা দেবে না, কারণ ধূমকেতু সূর্যের অনুসূর স্থান থেকে তখন ৯ই ফেব্রুয়ারী অপেক্ষা একটু বেশী দূরত্বে রয়েছে। "গ" চিহ্নিত স্থানে ধূমকেতু সূর্যের সব চেয়ে কাছে থাকবে এবং এই অবস্থায় তার লেজ প্রকাণ্ড আকার ধারণ করবে। কিন্তু পৃথিবীর অবস্থান লক্ষ্য করুন। ধূমকেতু সূর্যের এক দিকে, পৃথিবী সম্পূর্ণ তার বিপরীত দিকে। এই অবস্থায় ধূমকেতু দেখা সম্ভব নয়।

মাসভিত্তিক হ্যালির ধূমকেতু দেখার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গ আমরা শেষ করব।

নভেম্বর শেষ থেকে ডিসেম্বর শেষ, ১৯৮৫ সাল

হ্যালির ধূমকেতু পশ্চিম আকাশে উঠবে। সূর্যাস্তের পর থেকে সন্ধ্যারাত্রির সামান্য সময় পর্যন্ত উত্তর গোলার্দ্ধ থেকে একে আমরা দেখার আশা করতে পারি। কিন্তু খালি চোখে দর্শনীয়তার যথেষ্ট

সমস্যা আছে। খুবই অনুজ্জ্বল, চোখে পড়ে কি পড়ে না, এই রকম অবস্থা। ছোট্ট একটা তারার মতনই মনে হবে। মোটামুটি ভাল পাওয়ারের বাইনোকুলার ব্যবহার করা ভাল।

জানুয়ারীর প্রথম ১৯৮৬ সাল

পশ্চিম আকাশে দেখা যাবে। সন্ধ্যারাত্রির সময়। বেশ উজ্জ্বল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আশা করা হচ্ছে সপুচ্ছ (তবে ছোট আকারে) খালি চোখে দেখা যাবে।

জানুয়ারীর শেষ, ১৯৮৬ সাল

মাসের শেষ নাগাদ হ্যালির ধূমকেতু সূর্যের আরও কাছে এগিয়ে আসবে। সূর্যের সামনে তখন হ্যালির ধূমকেতু চলে আসছে, আর পৃথিবী তখন ধূমকেতু সাপেক্ষে বিপরীত গতিমুখে এগিয়ে চলেছে। সূর্যের প্রখর উজ্জ্বলতায় ধূমকেতুকে বাইনোকুলার দিয়েও দেখা অসম্ভব হবে।

৯ই ফেব্রুয়ারী

আশা করা হচ্ছে এই তারিখে হ্যালির ধূমকেতু সূর্যের সব চেয়ে কাছে বা অনুসূর (Perihelion) স্থানে এসে হাজির হবে।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ

সূর্য উদয়ের কিছু আগে প্রায় ভোর রাতের দিকে ঘণ্টাখানেক সময়ের মতো আকাশের পূর্ব দিকে দেখা যাবে। তবে আমাদের চোখে এখনও তেমন একটা দর্শনীয় হয়ে উঠবে না।

মার্চ মাস

ভোর হয়ে আসছে। পূব আকাশে খালি চোখে হ্যালির ধূমকেতুকে দেখা যাবে। এখন থেকে মোটামুটি ভালই দেখা যাবে বলে আশা করতে পারি। সপুচ্ছ ধূমকেতুটা দিগন্ত থেকে আকাশের ১৫° থেকে ২০° পর্যন্ত স্থান অধিকার করে থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

১১ই এপ্রিল

পৃথিবী থেকে ধূমকেতুর দূরত্ব সব চেয়ে কম, কিন্তু সূর্য থেকে

বেশ দূরে বলে প্রকাণ্ড দেখা যাবে না। তবে সপুচ্ছ আকাশের প্রায় ২০° ভাগ জুড়ে থাকবে এবং মোটামুটি উজ্জ্বল দেখা যাবে। দেখার স্থান, পশ্চিম আকাশ।

এপ্রিল শেষ হচ্ছে

সন্ধ্যে হল। আবার পশ্চিম আকাশে দেখা দিতে শুরু করবে। তবে আকারে ছোট হয়ে আসছে।

মে মাসের মাঝামাঝি

খালি চোখে দেখা মুশকিল হবে। দূরবীনযন্ত্র ব্যবহার করা ছাড়া কোন গতি থাকবে না।

৯

ধূমকেতুর কক্ষপথ

আগামী দিনে হ্যালির ধূমকেতুর আগমন উপলক্ষ্যে যে-আগ্রহের সঞ্চার রয়েছে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে ধূমকেতুটা সম্বন্ধে আলাদাভাবে আমরা কিছু আলোচনা করে নিয়েছি। এখন থেকে সাধারণভাবে আমরা ধূমকেতু সম্বন্ধে নানান তথ্য বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। বর্তমান প্রসঙ্গ থেকে ধূমকেতুর কক্ষপথ দিয়ে আমরা এই আলোচনার সূত্রপাত করছি।

দু-চার কথায় প্রথমে গ্রহদের কক্ষপথ নিয়ে আমরা কিছু বলে নেব। গ্রহদের পরস্পরের কক্ষপথের আকৃতির মধ্যে গরমিল তেমন কিছু নেই। এদের কক্ষপথ মূলতঃ এক-একটি উপবৃত্তাকার বলতে অবশ্য ডিমের আকারের মতন নয়। এক রকম গোলাকারই বলা চলতে পারে, তবে সামান্য একটু চাপা। এই জন্যই গ্রহদের কক্ষপথ মুখ্যতঃ উপবৃত্তাকার হওয়া সত্ত্বেও একে আমরা প্রায়-বৃত্তাকার বা বৃত্তাভাস অর্থাৎ ellipse বলতে পারি। এদের কক্ষপথতল আমাদের পৃথিবীর কক্ষপথতলের সঙ্গে মোটামুটি প্রায় একই সমতলে আছে, এমন একটা কিছু বিরাট আনতি (inclination) সৃষ্টি করে নেই।

কিন্তু ধূমকেতুদের ক্ষেত্রে এই সব নিয়মের ব্যতিক্রম ধরা পড়বে। কথাটা ঠিক যে ধূমকেতুর কক্ষপথও উপবৃত্তাকার। কিন্তু উপবৃত্তাকার বলতে প্রত্যেক ধূমকেতুর পথ এক রকমের হয় না, রকমফের হতে পারে। পৃথিবীর কক্ষপথ সাপেক্ষে ধূমকেতুদের কক্ষপথতল নানাভাবে হেলে (inclined) থাকে। এদের কক্ষপথ পরাবৃত্তাকার বা hyperbola-ও হতে পারে, আবার নিছক উপবৃত্তকার বা elliptical-ও হতে পারে। যাদের পথ আবার পরাবৃত্তাকার বা

অধিবৃত্তাকার নয়, কিন্তু শুধুই উপবৃত্তাকার, এই পথ সেখানে দুরকমেরও হতে পারে। এক হল দীর্ঘ উপবৃত্তকার, আর অন্যটা হল হ্রস্ব উপবৃত্তাকার। দীর্ঘ উপবৃত্তাকারে পরিক্রমণের পথ ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো কিংবা তার পরের জায়গা পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে, কিন্তু ছোট উপবৃত্তাকারে চলার পথ সাধারণত বৃহস্পতি, শনির এলাকায় আবদ্ধ থাকে।

কেপলারের সূত্রের ভিত্তিতে নিউটন যখন তাঁর অভিকর্ষের আওতায় বস্তুর গতি বুঝতে চাইলেন তখন তিনি বললেন যদি কোন জ্যোতিষ্ক সূর্যের আকর্ষণের প্রভাবে তার চারদিকে ঘুরতে থাকে তাহলে তার পথ বৃত্তাকারও হতে পারে, কিংবা পরাবৃত্তাকার, অধিবৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকারও হতে পারে। পাশের রেখাচিত্রটা দেখা যাক।
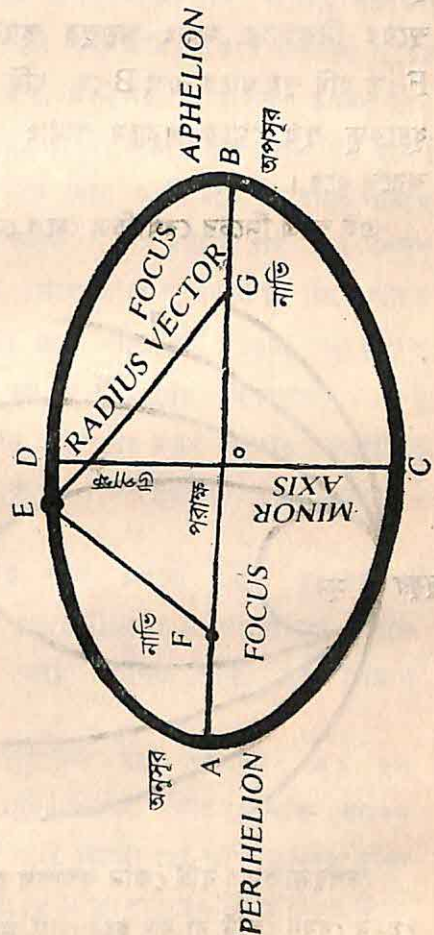
AOC এবং D O C উপবৃত্তের দুটি অক্ষ বা axis। AOB কে আমরা বলব পরাক্ষ বা Major Axis এবং DOC কে বললাম উপাক্ষ বা Minor Axis এই পরাক্ষ এবং উপাক্ষ, একটির উপরে আর একটি আড়াআড়িভাবে রয়েছে। আবার AO পর্যন্ত বলা হল অর্দ্ধ-পরাক্ষ বা Semi-major Axis। এখন F এবং

G এক দুই বিন্দুকে বলা হল উপবৃত্তের ফোকস (Focus) বা নাভি। এই দুই বিন্দুই পরাক্ষে অবস্থিত। E হল দূরক বা radius vector। এইবার উপবৃত্তের আকৃতির ধরণ নির্ভর করবে পরাক্ষ বা Major Axis-এর দৈর্ঘ (FE+GE) অর্থাৎ দুটি ফোকসের (FG) মাঝের দূরত্ব কত হচ্ছে তার উপর। এখন A-তে যদি ধূমকেতু থাকে এবং F-তে যদি সূর্য থাকে তাহলে এই ধূমকেতু সূর্যের নিকটতম অর্থাৎ অনুসূর স্থানে আছে মনে করতে হবে এবং F-তে যদি সূর্য থাকে এবং B-তে যদি ধূমকেতু থাকে তাহলে এই ধূমকেতু সূর্য থেকে দূরতম অর্থাৎ অপসূর স্থানে আছে বলে মনে করতে হবে।

এই সূত্রে নিচের রেখাচিত্র দেখে নেওয়া যাক।
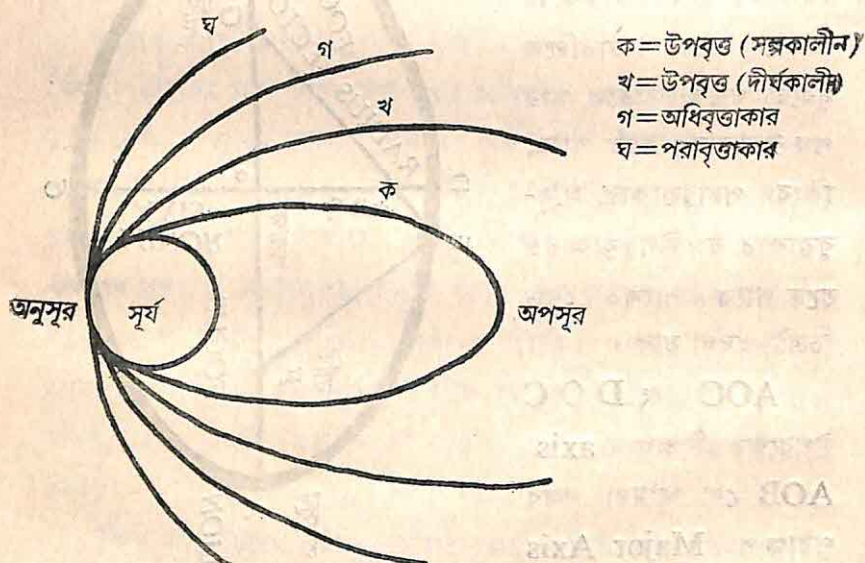
উপবৃত্তাকারে যদি কোন কক্ষপথ হয় তাহলে তার অক্ষ বা axis যেমন যেমন ছোট বা বড় হবে সেই অনুপাতে কক্ষপথের আকৃতিরও পরিমাপ পাওয়া যাবে। এই অক্ষ দীর্ঘ বা হ্রস্ব যে-ধরণেরই হবে তার সম্পর্ককে বলা হবে উৎকেন্দ্রতা বা ecentricity। বৃত্তের ক্ষেত্রের উৎকেন্দ্রতার ব্যাপারে কোন গোলমাল থাকে না। এই

উৎকেন্দ্রতাকে তখন O ধরলেই চলে। কিন্তু অধিবৃত্তকার কক্ষপথের জন্য এই উৎকেন্দ্রতা ধরা হয়েছে ১·০। বলার অপেক্ষা রাখে না যেসব পথ বৃত্তাকারে হবে তার কোন মুখই খোলা থাকবে না, আবদ্ধ থাকবে, কিন্তু অধিবৃত্তাকারের ক্ষেত্রে তা হয় না, তার অপসূরের মুখ খোলা থাকবে। এই জন্যই যেসব ধূমকেতু অধিবৃত্তাকার পথে চলতে শুরু করে সূর্যের কাছে তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম থেকে যায়। তাই বলে কিন্তু অধিবৃত্তাকার কক্ষপথ সূর্যের অভিকর্ষের বাইরে যে চলে যায়, এমন নয়। অভিকর্ষ তখনও তার উপর প্রভাব ফেলবে, কিন্তু তার জোরটা অত্যন্ত দুর্বল প্রমাণিত হবে। সূর্যের অভিকর্ষবল ধূমকেতুটাকে তার চারিদিকে ঘোরাতে পারবে না। পরাবৃত্তকার পথ আরও অদ্ভুত। এই ধরণের পথ ধরে যেসব ধূমকেতু চলতে থাকে বলতে গেলে তারা সূর্যের কাছে ফিরে আসে না। যদি আসে তাহলে সেটা হবে নিতান্তই একটা আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু এমনটা সহজে হয় না। এদের উৎকেন্দ্রতা ১·০০-র চেয়ে বেশী হয় এবং অধিবৃত্তাকার কক্ষপথের মতন এদেরও কক্ষপথের মুখ আবদ্ধ নয় বলে এদের কারও অপসূরবিন্দু (aphelion) থাকে না।

এখন প্রশ্ন হল উপবৃত্তাকার পথে চলতে গিয়ে ধূমকেতুদের যেভাবে বক্ররৈখিক গতি বা curvilinear motion গড়ে তুলতে হয়েছে এর কারণটাই বা কী, কোন্ ধরণের শক্তি এর পিছনে কাজ করছে ?

দু-ধরণের শক্তির কথা আমাদের মনে পড়বে। এক হল অপকেন্দ্রিক শক্তি বা centrifugal force অর্থাৎ যে-শক্তি কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে বা অভিকর্ষ, আর অন্যটা হল অভিকেন্দ্রিক শক্তি বা centripetal force অর্থাৎ যে-শক্তি বাইরের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। এই দুই শক্তি পরস্পরের মধ্যে একটা সাম্যের অবস্থা তৈরী করে। দুই বস্তুর মধ্যে অনেকটা তখন যেন একটা টাগ অব ওয়ারের মতন অবস্থা গড়ে ওঠে। এর মাধ্যমেই নির্দ্ধারিত হয় পরিক্রমণ পথ বৃত্তাকারে হবে, না পরাবৃত্তাকার, অধিবৃত্তাকার অথবা

উপবৃত্তাকার হবে। যদি উপরোক্ত দুই শক্তি সমান সমান হয়ে যায় তাহলেই আমরা বৃত্ত পেয়ে যাব। কিন্তু অপকেন্দ্রিক এবং অভিকেন্দ্রিক শক্তির মধ্যে টানাটানির কম বেশী হেরফের হলেই আর বৃত্ত থাকে না, বিভিন্ন ধরণের উপবৃত্তাকার পথ হয়ে যায়।

এই সব তথ্যের ভিত্তিতে যে কোনও ধূমকেতুর কক্ষপথ নিয়ে বিজ্ঞানীদের যখন কোন কথা ভাবতে হয় তখন তাঁদের কক্ষপথ সম্বন্ধীয় কিছু নির্দেশ বা orbital elements-এর উপর নজর রেখে কাজ করে যেতে হয়। এতে কাজটা খুব বাঁধাধরা পথে এগোতে পারে। ভুলভ্রান্তিগুলো এড়ানো যায়। যেমন,

(১) প্রথম কথা হল কক্ষপথের অর্দ্ধ-পরাক্ষ বা Semi-major Axis জানা দরকার। কারণ এই অর্দ্ধ-পরাক্ষই কক্ষপথ ছোট না বড় তার আকার বলে দেয়।

(২) সঙ্গে সঙ্গেই কক্ষপথের উৎকেন্দ্রতা বা eccentricity জানার চেষ্টা চলে। কারণ এই উৎকেন্দ্রতার মাধ্যমেই কক্ষপথ ঠিক কোন্ শ্রেণীর অর্থাৎ তার আকৃতিগত পরিচয় ঠিক করে ফেলা যায়।

(৩) ক্রান্তিবৃত্ত তলের (ecliptic plane = পৃথিবীর কক্ষতল) সঙ্গে ধূমকেতুর কক্ষপথের আনতি বা inclination to the ecliptic plane কীরকম অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্ত তলের উপর ধূমকেতুর কক্ষপথ কতটা হেলে আছে সেই বিষয়েও একটা জ্ঞান থাকা দরকার।

(৪) তাছাড়া এটাও জানা দরকার যে সূর্যের চারদিকে ধূমকেতু পরিক্রমণের সময় কী রকম অর্থাৎ ধূমকেতু তার গোটা পথটায় একবার ঘুরে আসতে কত সময় নেয়।

(৫) সূর্য থেকে ধূমকেতুটার অনুসূর দূরত্ব বা perihelion distance কত হবে এটাও জেনে নিতে হবে।

(৬) এই সঙ্গে ধূমকেতু যখন অনুসূর অতিক্রম করবে (perihelion passage) তখন সেই সময়টার একটা হিসেবেরও যেন জ্ঞান থাকে।

(৭) ধূমকেতু যখন ক্রান্তিবৃত্ত তল ছেদ করে যায় তখন সেই ছেদবিন্দু বা পাতবিন্দু (node) অবস্থান বের করতে হবে।

(৮) ধূমকেতুর কক্ষতলে পাতবিন্দু থেকে অনুসূর পর্যন্ত কোণকে আমরা অনুসূরের আর্গুমেন্ট (argument of perihelion) বলি। একে সূর্যকেন্দ্রিক দ্রাঘিমাও (heliocentric longitude= longitude of perihclion) বলা হয়। ধূমকেতুর অবস্থান বুঝতে এর জ্ঞান খুব কাজে লাগে।

১০

নিয়মিত ও অনিয়মিত ধূমকেতু

এক-একটা ধূমকেতু সূর্যের কাছে আসা-যাওয়া করতে কম হোক বেশী হোক যা হোক একটা সময় নেয়। ধূমকেতুদের এই আসা-যাওয়ার সময়ের হিসেব নির্দ্ধারণ করার সময় বিজ্ঞানীদের ধূমকেতুকে দুভাগে ভাগ করে নিতে হয়েছে। এটা ধূমকেতুদের শ্রেণীচরিত্র বোঝার কাজে সাহায্য করে।

এক শ্রেণীর ধূমকেতু আছে যারা দেখা গেল একটা নিয়ম করে মোটামুটি নির্দিষ্ট সময় মেপে সূর্যের কাছে আসা যাওয়া করে। এদের বলা হল পর্যায়িক বা নিয়মিত অর্থাৎ periodic ধূমকেতু। কিন্তু এমনও অনেক ধূমকেতু আছে যাদের ক্ষেত্রে সময়ের হিসেব রাখার কোন বালাই নেই। একবার তারা হয়তো সূর্যের কাছে এল, কিন্তু তারপর আর তারা সূর্যের কাছে আদৌ আসবে কি না এটা অনেক সময়েই আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না। এদের বলা হয়েছে অনিয়মিত বা non-periodic ধূমকেতু।

কিন্তু সময়ের পরিমাপ অনুসারে নিয়মিত ধূমকেতুকেও আবার দু-ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। এক হল স্বল্পকালীন (নিয়মিত) ধূমকেতু, আর অন্যগুলো হল দীর্ঘকালীন (নিয়মিত) ধূমকেতু। আবার যারা স্বল্পকালীন ধূমকেতু তাদেরও দুটো উপবিভাগ করে নেওয়া চলতে পারে। এমন অনেক ধূমকেতু আছে যারা ঘন ঘনই সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে যায় এবং এদের সূর্য-পরিক্রমণের কাল থেকে ১০/১২ বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। যেহেতু এরা এত কম বছরের সময় নিয়ে সূর্য-পরিক্রমা করে বলা বাহুল্যই এদের কক্ষপথ দীর্ঘ উপ-বৃত্তাকার হয় না এবং সেই হিসেবে এদের কক্ষপথের উৎকেন্দ্রতাও বেশী হয় না। সূর্যকে একটা নাভিমূলে রেখে এদের কক্ষপথের একটা

প্রান্ত সূর্যের কাছে থাকে, আর অন্য প্রান্তটা সূর্য থেকে দূরতম বিন্দু অর্থাৎ অপসূর সাধারণত বৃহস্পতির কাছ-বরাবর জায়গা ঘুরে আসে। কিন্তু দীর্ঘকালীন ধূমকেতুদের ক্ষেত্রে তা হয় না।
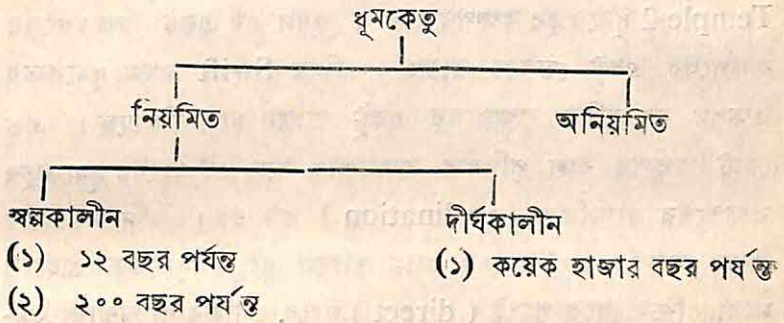
সঙ্গে সঙ্গে নিচের রেখাচিত্রটাও লক্ষ্য করুন।
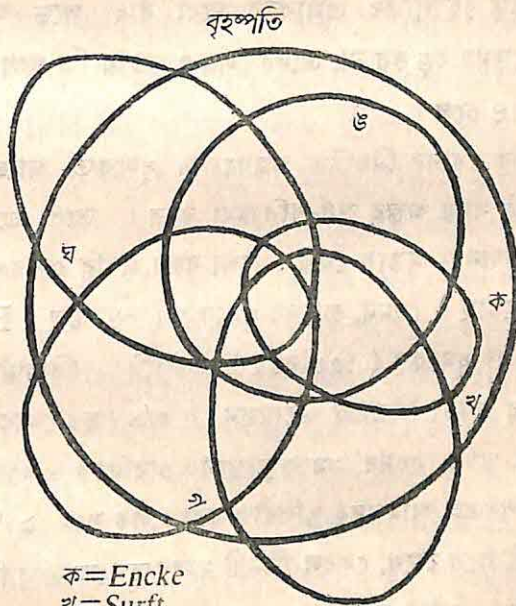
ক=Encke
খ=Surft
গ=Temple 1
ঘ=Temple 2
ঙ=Winneeke

এদের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি Encke-র ধূমকেতুর কক্ষপথই সব চেয়ে ছোট। সূর্য থেকে দূরতম অবস্থিতিতেও এই ধূমকেতুর

কক্ষপথ বৃহস্পতির কক্ষপথ অতিক্রম করছে না। সূর্যকে একবার বেড় দিয়ে আসতে সময় নেই মাত্র ৩½ বছর। Temple-1 ধূমকেতুটার কক্ষপথও লক্ষ্য করুন মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথের একটু বাইরে থেকে শুরু করে বৃহস্পতিকক্ষের একেবারে প্রান্তসীমায় গিয়ে পৌঁছেছে। Temple-2 ধূমকেতুর কক্ষপথও তাই, কেবল এর একটা দিক মঙ্গলের কক্ষপথের একটু ভেতরে রয়েছে। কিন্তু Swift নামে ধূমকেতুর কক্ষপথ বৃহস্পতির কক্ষপথের একটু বাইরে চলে গিয়েছে। এত ছোট কক্ষপথ বলে পৃথিবীর কক্ষতলের সঙ্গে এই ধরণের ধূমকেতুর কক্ষপথের আনতিও (inclination) কম হয়। যদি দেখা যায় এদের আনতি ৯০°-র কম হচ্ছে তাহলে এই সব ধূমকেতুর গ্রহদের মতো পশ্চিম থেকে পূবেই (direct) ঘুরবে, হ্যালির বা অন্যান্য ধূমকেতুদের মতন পূব থেকে পশ্চিমে (reterograde) ঘুরবে না। যেসব ধূমকেতু বৃহস্পতির এলাকার মধ্যে বাঁধা পড়ে আছে তারা আকারেও তেমন বড় হয় না, এদের লেজও গজায় কি গজায় না এই রকম অবস্থাও চলে।

আর এক ধরণের নিয়মিত স্বল্পকালীন ধূমকেতু আছে। এরাও একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর সূর্য-পরিক্রমা করে। তবে এদের আসা-যাওয়ার ব্যবধানটা অত্যন্ত বেশী। দুশো বছর অবধি এদের পরিক্রমণের সময় ধরা হয়েছে। যেমন, হ্যালির ধূমকেতু (৭৬ বছর), Herschel-Rigollet-এর ধূমকেতু (১৫৬ বছর), ইত্যাদি। বিজ্ঞানীরা হিসেব-নিকেশ করে একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ৩/৪ বছর থেকে শুরু করে ২০০ বছর পর্যন্ত যেসব ধূমকেতু সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে যায় তাদের কক্ষপথতল আমাদের পৃথিবীর কক্ষতলের সঙ্গে ৯০°-র মধ্যেই আনতি সৃষ্টি করে রাখে, কেবল তিনটি ধূমকেতুর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গিয়েছে। এরা হল হ্যালির ধূমকেতু (আনতি ১৬২·২), Grigg-Mellish ধূমকেতু (১০৯·৭) এবং Temple Tuttle ধূমকেতু(১৬২·৭)। যেহেতু এদের আনতি ৯০°-র বেশী অতএব এরা পশ্চিম থেকে পূবে ঘোরে না, কিন্তু এর বিপরীত দিকে পূব থেকে পশ্চিমেই ঘোরে।

এই সব নিয়মিত স্বল্পকালীন ধূমকেতুদের পরিক্রমণকাল বিচার করে একটা সাধারণ কথা আমরা বলতে পারি।যেসব ধূমকেতু সূর্যের চারদিকে একবার তাদের পরিক্রমণকাল শেষ করতে ৫ থেকে ১২ বছরের মতন সময় নেয় তাদের কক্ষপথ বৃহস্পতির এলাকা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে থাকে, ১৩ থেকে ১৮ বছরের মতন যাদের পরিক্রমণকাল তারা শনির কাছে যায়, প্রায় ২৮ বছরের মতন যারা সময় নিচ্ছে তারা ইউরেনাসের দূরত্ব পর্যন্ত বাঁধা পড়ে থাকে এবং ৫০ থেকে ৮০ বছর পর্যন্ত যারা সময় নেয় তারা সাধারণত নেপচুনের কাছাকাছিই থাকে। খুব বেশী সংখ্যায় কিন্তু স্বল্পকালীন ধূমকেতুদের কথা জানা যায়নি। অনুমান করা হয়েছে ১০০-র মধ্যেই এরা সীমাবদ্ধ আছে।

যারা নিয়মিত ধূমকেতু অথচ যারা দীর্ঘকালীন, আমাদের জন্য তারা অপরিসীম বিস্ময় জমা করে রেখেছে। বিশাল এদের কক্ষপথ, দুশো-একশো বছরের কোন ব্যাপার নয়, সূর্য-পরিক্রম করতে স্বচ্ছন্দে এরা কয়েক হাজার বছর লাগিয়ে দিতে পারে। যেমন, Barbon 1966 II ধূমকেতু অথবা Kohoutek 1970 III ধূমকেতুর কথা একটু চিন্তা করুন। এদের সূর্য-পরিক্রমণের কাল হল যথাক্রমে ৩৪,০০০ বছর এবং ৮৩,১০০ বছর। ভাবতে যেন কেমন লাগে।

আবার যারা অনিয়মিত ধূমকেতু তারা আমাদের জন্য শুধু বিস্ময়ই উদ্রেক করে না, এদের নিয়ে আমাদের প্রচুর ভাবনা, নানান সমস্যা। সুইডেনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্টোমগ্রেন (Strimgren) এবং হল্যাণ্ডের জ্যোতিবিজ্ঞানী ফান বিলো (Van Bilo) একবার একটা প্রস্তাব করেছিলেন ধূমকেতুর পথ আদিতে পরাবৃত্তাকার থাকে না, এদের পথ উপবৃত্তাকারই হয়, কিন্তু কার্যকরণের প্রভাবে এই উপবৃত্তাকার পথ অবশেষে পরাবৃত্তাকারে পরিণত হয়। এঁদের যুক্তি ছিল উপবৃত্তাকার পথ ধরে চলতে চলতে কোন ধূমকেতু সৌরমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করে খুব স্বাভাবিকভাবেই বিরাট কোন গ্রহের নিকটবর্তী হতে পারে। তখন বিশাল সেই গ্রহের প্রবল অভিকর্ষের জোরে ধূমকেতুটার চলার সব রকম ছন্দ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই অবস্থায় তার গতিবেগ

এত প্রচণ্ড বেড়ে যাবে যে সে তখন নিজের পথ থেকে ছিটকে গিয়ে উদভ্রান্তের মতন দৌড়তে থাকবে। ফলে উপবৃত্তাকার পথ আর থাকবে না, সেই পথ তখন পরাবৃত্তাকারে পরিণত হবে। অতএব যেসব ধূমকেতু পরাবৃত্তাকার বা hyperbolic পথে সূর্যের কাছে চলে আসে তারা সূর্যকে একবার বেড় দিয়ে তারপর সেই যে কোথায় উধাও হয়ে যায়, কস্মিনকালে আর কোন দিন সূর্যের কাছে আসবে কি না, এসব কথা আমরা কেউই কোন দিন জোর দিয়ে বলতে পারি না।

যাই হোক, এখন আমরা কিছু নিয়মিত এবং অনিয়মিত ধূমকেতুর তালিকা তৈরী করছি। এর দ্বারা প্রদত্ত ধূমকেতুদের পরিক্রমণকাল, উৎকেন্দ্রতা এবং আনতি সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করতে পারব।

(ক) নিয়মিত (periodic) ধূমকেতু/স্বল্পকালীন : ২০০ বছর পর্যন্ত।

নাম	বছর Period	উৎকেন্দ্রতা Eccentricity	Inclination
১. Pons-Winnecke	৬.৩০	০.৬৩৯	২২.৩
২. Giacobini-Zinner	৬.৪১	০.৭২৯	৩০.৯
৩. Brorsen	৫.৪৬	০.৮১০	২৯.৪
৪. Temple 1	৫.৯৮	০.৪৬৩	৯.৮
৫, Temple 2	৫.২৬	০.৫৪৯	১২.৫
৬. Tuttle-Giacobini Kresak	৫.৪৮	০.৬৩৯	১৩.৮
৭. Honda-Mrkos Pajdusakova	৫.২১	০.৮১৫	১৩.২
৮. Encke	৩.৩০	০.৮৪৭	১২.০
৯. de Vico-Swift	৬.৩১	০.৫২৪	৩.৬
১০. Grigg-Skjellerup	৪.৯১	০ ৭০৩	১৭.৬
১১. Temple-Swift	৫.৬৮	০.৬৩৮	৫.৪
১২. Kapff	৬.৩১	০.৫৫৫	৪ ৭
১৩. Faye	৭.৩৮	০.৫৭৬	৯.১
১৪. Daniel	৭.০৯	০.৫৫০	২০.১
১৫. Forbes	৬.৪২	০.৫৫৩	৪.৬
১৬ Arend	৭.৭৯	০.৫৩৪	২১.৭
১৭. Wolf	৮.৪৩	০.৩৯৫	২৭.৩
১৮. Borelly	৭.০২	০.৬০৩	৩১.১
১৯. Oterma	৭.৮৮	০.১৪৪	৪.০
২০. Comas Sola	৮.৫৯	০.৫৭৬	১৩.৪
২১. Tuttle	১৩.৬১	০.৮২১	৫৪ ৭
২২. Finlay	৬.৯০	০.৭০৩	৩.৬
২৩. Johnson	৬.৮৬	০.৩৭৭	১৩.৯
২৪. Gale	১০.৯৯	০.৭৬১	১১.৭
২৫. Harrington	৬ ৮০	০.৫৫৯	৮.৭
২৬. Olbers	৬৯.৫৭	০ ৯৩০	৪৪.৭

নাম	বছর Period	উৎকেন্দ্রত Eccentricity	আনতি Inclinetion
২৭. Biela	৬.৬২	০.৭৫৬	১২.৬
২৮. Whipple	৭.৪৬	০.৩৫১	১০.২
২৯. Schaumasse	৮.১৮	০.৭০৫	১২.০
৩০. Harrington-Abell	৭.২২	০.৫২২	১৬.৮
৩১. Arend-Rigaux	৬.৮২	০.৬০০	১৭.৮
৩২. Parrine-Mrkos	৬.৭১	০.৬৪৩	১৭.৮
৩৩. Holmes	৭.৩৫	০.৩৫৯	১৯.৫
৩৪. Neujmin 1	১৭.৯৭	০.৭৭৪	১৫.০
৩৫. Neujmin 2	৫.৪৩	০.৫৬৪	১০.৬
৩৬. Neujmin 3	১০.৯৫	০.৫৮৮	৩.৮
৩৭. Wolf-Horrington	৬.৫৪	০.৫৩৮	১৮.৫
৩৮. Ashbrook-Jackson	৭.৪৯	০.৩৯৬	১.২৫
৩৯. Reinmuth 1	৭.৬০	০.৪৮৭	৮.৩
৪০. Reinmuth 2	৬.৭১	০.৪৫৭	৭.০
৪১. d'Arrest	৬.৬৭	০.৬১৪	১৮.১
৪২. Schwassmann-Wachmaun 1	১৬.১০	০.১৩২	৯.৫
৪৩. Schwassmann-Wachmaun 2	৬.৫৩	০.৩৮৩	৩.৭
৪৪. Wirtanen	৬.৬৭	০.৫৪৩	১৩.৪
৪৫. Crommelin	২৭.৮৭	০.৯১৯	২৮.৯
৪৬. Grigg-Mellish	১৬৪.৩	০.৯৬৯	১০৯.৮
৪৭. Halley	৭৬.৪	০.৯৬৭	১৬২.২
৪৮. Van Biesbroeck	১২.৪১	০.৫৫০	৬.৬
৪৯. Pons-Brooks	৭০.৮৬	০.৯৫৫	৭৪.২
৫০. Brooks-2	৬.৭২	০.৫০৫	৫.৬
৫১. Herschel-Rigollet	১৫৬.০	০.৯৭৪	৬৪.২
৫২. Brorsen-Metcalf	৬৯.৬	০.৯৭১	১৯.২
৫৩. Westphal	৬১.৭৩	০.৯২০	৪০.৯
৫৪. Stephen-Oterma	৩৮.৯৬	০.৮৬১	১৭.৯
৫৫. Temple-Tuttle	৩২.৯১	০.৯০৪	১৬২.৭
৫৬. Vaisala	১০.৪৬	০.৬৩৬	১১.৩

(খ) নিয়মিত ধূমকেতু/দীর্ঘকালীন : কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত

নাম	বছর Period	উৎকেন্দ্রতা Eccentricity	আনতি Inclination
১. Ikeya 1964 VIII	৩৬৩	০.৯	১৭১.৯
২. Bennet 1970 II	১৭৩০	০.৯	৯০.০
৩. Ikeya-Everhart 1966 IV	১৮৩০	০.৯	৪৮.৯
৪. Everhart 1964 IX	৬৬৯০	০.৯	৬৪.০
৫. Humason 1962 VIII	২৯০০	০.৯	১৫৩.৩
৬. Barbon 1966 II	৩৪০০০	০.৯	২৮.৭
৭. Seki 1967 IV	৪৪২০	০.৯	১০৬.৫
৮. Thomas 1969 I	১৮৪০০	০.৯	৪৫.২
৯ Ikeya-Seki 1968 I	৮৯৪০০	০.৯	১২৯.৩
১০. Kilston 1966 I	১৬২০০	০.৯	৪০.৩
১১. Tago-Sato-Kosaka 1969 IX	৪১৯০০০	০.৯	৪৫.২
১২ Kohoutek 1970 III	৮৩১০০	০.৯	৮৬.৩
১৩. Mrkos 1957 V	১২৮০০	০.৯	৯৩.৯
১৪. Alcock 1963 III	১৫৪০০	০.৯	৮৬.২

(গ) অনিয়মিত ধূমকেতু/পরিক্রমণের কাল জানা যায় নি।

নাম	বছর Period	উৎকেন্দ্রতা Eccentricity	আনতি Inclination
১. Delavan 1914 V	—	১.০	৬৮.০
২. Wells 1882 I	—	০.৯	৭৩.৮
৩. Klinken berg	—	১.০	৪৭.১
৪. Alcock 1965 IX	—	১.০	৬৫.০
৫. Alcock 1959 F	—	১.০	১০৮.০
৬. Alcock 1959 IV	—	১.০	৩৮.৩
৭. Morehouse 1908 III	—	১.০	১৪০.২
৮. Daniel 1907 IV	—	০.৯	৮.৯
৯. Donati 1858 VI	—	০.৯	১১৭.০
১০. Hevelius 1664	—	১.০	১৫৮.৭
১১. Hevelius 1665	—	১.০	১০৩.৯
১২. Stearns 1827 IV	—	০.৯	৮৭.৭
১৩. Arend-Roland 1957 III	—	১.০	১২০.০

নাম	বছর Period	উৎকেন্দ্রতা Eccentricity	আনতি Inclination
১৪. Sarabat 1729	—	১.০	৭৭.১
১৫. Coggia 1874 III	—	০.৯	৬৬.৯
১৬. Skjellerup 1927 IX	—	১.০	৮৫.১
১৭. Tebbutt 1861 II	—	০.৯	৮৫.৪
১৮. Flaugergues 1811 I	—	০.৯	১০৬.০
১৯. Kirch 1680	—	০.৯	৬০.৭
২০. Whipple-Fedtke-Tevzadge 1943 I	—	০.৯	১৯.৭
২১. Wilson-Hubbard 1961 V	—	১.০	২৪.২
২২. Abe 1970 XV	—	১.০	১২৬.৭
২৩. Tago-Honda-Yamamoto 1968 IV	—	১.০	১০২.২
২৪. Suzuki-Sato-Seki-1970 X	—	১.০	৬০.৮
২৫. Fujikawa 1969 VII	—	১.০	৯.০
২৬. Rudnicki 1967 II	—	১.০	৯.১
২৭. Daido-Fujikawa 1970 I	—	১.০	১০০.১
২৮. Honda 1968 VI	—	১.৩	১২৮.০
২৯. Pajdusakova 1954 II	—	১.০	১৩.৬
৩০. Bally-Clayton 1968 VII	—	১.০	৯৩.২
৩১. Whitaker-Thomas 1968 V	—	১.০	৬১.৮
৩২. Wild 1968 III	—	১.০	১৩৫.৩
৩৩. Wild 1967 III	—	১.০	৯১.১
৩৪. Brahe 1577	—	১.০	১০৪.৯
৩৫. Mitchell-Jones-Gerber 1967 VII	—	১.০	৫৬.৭

* বাংলা অক্ষরে উপরোক্ত ধূমকেতুগুলোর নাম দেওয়া থেকে আমরা বিরত থাকলাম। রোমান অক্ষরেই নামগুলো দেওয়া হল। কারণ, ধূমকেতুগুলোর মধ্যে এমন অনেক নাম আছে যেগুলোর ধ্বনিসম্মত উচ্চারণ বাংলায় ঠিক ঠিক লিপ্যন্তর করা মুশকিল। অতএব, আন্তর্জাতিক পদ্ধতিই অনুসৃত হল।

সংযোজন

কয়েকটি নিয়মিত ধূমকেতুর বৈশিষ্ট্য :

ধূমকেতু (নাম)	পরিক্রমণকাল	অপসূর (A.U.)	অনুসূর (A.U.)	আনতি	নিউক্লিয়াসের ব্যাস
Encke	৩.৩০	০.৩৩৯	৪.১০	১২.০	২ মাইল
Temple (2)	৫.২৬	১.৩৬৪	৪.৬৮	১২.৫	১.৫ "
Finlay	৬.৯০	১.০৮০	৬.১৭	৩.৬	০.৫ "
Faye	৭.৪১	১.৬১৬	৫.৯৮	৯.১	১.০ "
Kearns-Kwee	৯.০১	২.২২৯	৬.৪৩	৯.০	৮ "
Temple-Tuttle	৩২.৯১	০.৯৮২	১৯.৫৬	১৬২.৭	১০ "
Halley	৭৭.০৯	০.৫৪৭	৩৫.৩৩	১৬২.২	২২ "

১১

ধূমকেতুর গোষ্ঠী

আগের অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছিলাম বড় আকারের যেসব গ্রহ আছে অনেক সময়েই তারা ধূমকেতুর উপর নিজেদের প্রভাব খাটাতে পারে। এতে ধূমকেতুর কক্ষপথের আকৃতি যা ছিল সেরকম আর নাও থাকতে পারে, বদলে যেতে পারে।

মনে করা যাক কোন এক কালে কোন এক ধূমকেতু বিশাল আকারের অধিবৃত্তাকার বা পরাবৃত্তাকার পথ ধরেই তার উৎসস্থল থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু চলার পথে সে যখন গ্রহমণ্ডলের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল তখন বিরাট বিরাট গ্রহদের ত্রিসীমানায় তাকে আসতে হয়েছিল। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এরাই হল বিশালকৃতির গ্রহ। আবার গ্রহদের মধ্যে বৃহস্পতি হল বৃহত্তম। কিন্তু গ্রহদের মধ্যে বৃহস্পতিকে সব চেয়ে বড় আকারের একটা গ্রহ বললেও সবটুকু বলা হয় না। বৃহস্পতি হল এক অতিকায় গ্রহ, বৃহস্পতির যা আকার একটা গ্রহ হিসেবে তার এত বড় আকার লাভ করার কথা নয়। বাস্তবিক এই গ্রহ যদি তার বর্তমান আকারের চেয়ে আর একটু বড় আকারে পরিণত হত তাহলে সে আর গ্রহ থাকত না, নক্ষত্রে পরিণত হত। ভাবলে অবাক হতে হয় পৃথিবীর ব্যাস যেখানে মাত্র ৮০০০ মাইলের মতন যেখানে বৃহস্পতির ব্যাস হল ৮৮০০০ মাইল। তুল্যমূল্য বিচারে বৃহস্পতির ভরও পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশী। এবং শুধু পৃথিবীর কথাই বা বলছি কেন, অন্য সব গ্রহের একত্রিত ভরের প্রায় আড়াইগুণ বেশী হল বৃহস্পতির ভর। এইভাবে বহু ধূমকেতু সূর্য-পরিক্রমা করার সময় বিশালাকৃতির বৃহস্পতির কাছ দিয়ে জায়গা পার করতে গিয়ে বৃহস্পতির প্রবল অভিকর্ষের টানে সূর্য এবং বৃহস্পতির মাঝ-এলাকাটায় বন্দীদশা

প্রাপ্ত হয়েছে। এদের পথ তখন এত সংকুচিত হয়ে গিয়েছে যে সেটা উপবৃত্তাকারে পরিণত হয়েছে। সূর্য এবং বৃহস্পতির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে এরা সূর্য-পরিক্রমা করে বলে এরা যেমন স্বল্পকালীন (Short-period) ধূমকেতু তেমনি এদের আমরা নির্বিবাদে বৃহস্পতির পরিবারভুক্ত ধূমকেতুও বা Jupiter's family of comets বলতে পারি।
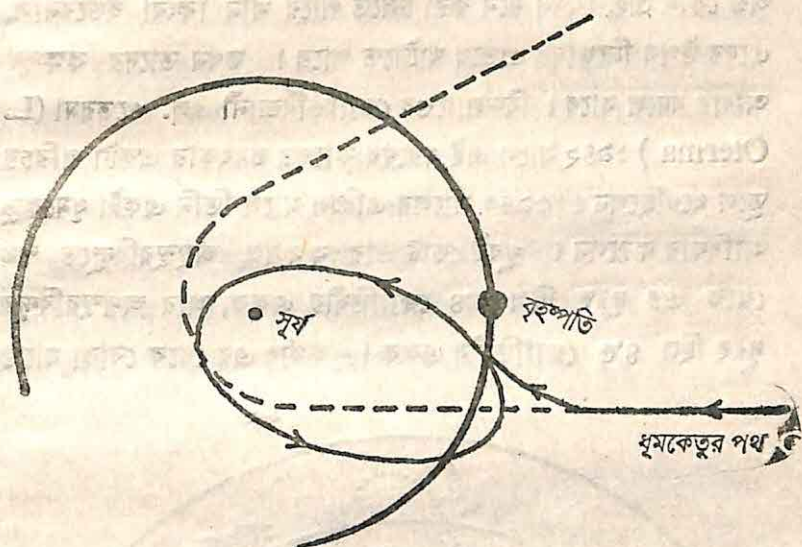
বৃহস্পতি ধূমকেতুর বড় পথকে ছোট করে দিচ্ছে

ঠিক কত ধূমকেতুকে বৃহস্পতির পরিবারভুক্ত ধূমকেতু বলা চলে এ সংখ্যা আজও নিখুঁতভাবে জানা যায় নি। সংখ্যায় এরা বড় জোর ৬০ থেকে ৭০-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এদের সূর্য-পরিক্রমণের কালও খুব কম, গড়পড়তার হিসেবে ৩·৩ থেকে ১০·২ বছর। এবার একটা উদাহরণে আসা যাক। প্রসঙ্গত আমরা Brooks 1889 V ধূমকেতুটার কথা বলতে পারি। ১৮৮৬ সালে এই ধূমকেতুটা বৃহস্পতির খুব কাছে আসতে শুরু করে, কিন্তু তখন তার সূর্য-পরিক্রমণের সময় নির্দ্ধারিত হয়েছিল ২৯ বছর। তবে এখন আর তা নেই। সূর্যকে এর বেড় দেওয়ার সময় ঠেকেছে মাত্র ৭ বছরে।

বৃহস্পতির কাছে যে সব ধূমকেতু বাঁধা পড়ে আছে তাদের সম্বন্ধে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এদের সব সময়েই কতকগুলো বিশেষ সমস্যার মোকাবিলা করে চলতে হয়। যেমন, প্রথমত,বর্তমানে যে-ধরণের গণ্ডীর মধ্যে এদের ঘোরাফেরা করতে হয় তার পরিসীমা চিরকালই যে একই রকম থাকবে এমন নাও হতে পারে। ভবিষ্যতে অন্য কোন গ্রহ, যেমন মনে করা চলতে পারে শনি কিংবা ইউরেনাস, এদের উপর নিজেদের প্রভাব খাটাতে পারে। তখন তাদের কক্ষপথ আবার বদলে যাবে। ফিনল্যাণ্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী এল. ওতেরমা (L. Oterma) ১৯৪২ সালে এই ধরণের কাজের চমৎকার একটা পরিচয় তুলে ধরেছিলেন। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে তিনি একটা ধূমকেতু আবিষ্কার করলেন। খুবই ছোট তার কক্ষপথ, অনুস্বরবিন্দুতে সূর্য থেকে এর দূরত্ব ছিল ৩.৪ জ্যোতিষীয় একক, আর অপস্বরবিন্দুর দূরত্ব ছিল ৪.৫ জ্যোতিষীয় একক। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে
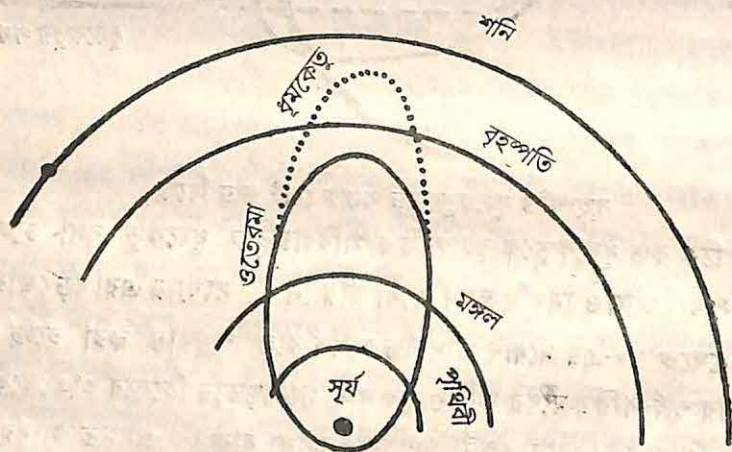
ওতেমরা ধূমকেতু

ধূমকেতুটার একটা প্রান্ত সূর্যকে বেড় দিচ্ছে আর অন্য প্রান্তটা মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝে রয়েছে। ওতেরমা এই ধূমকেতুর পরিক্রমণ-কালের হিসেব দিয়েছিলেন আট বছর। কিন্তু ১৯৬২ সালের জুলাই মাস থেকে দেখা গেল ধূমকেতুটা বৃহস্পতির কক্ষপথ পার করে চলে

যেতে চাইছে। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী নাগাদ শনির একেবারে কাছাকাছি গিয়ে হাজির হল। তখন থেকে আজ পর্যন্ত ওতেরমার আবিষ্কৃত এই ধূমকেতু বৃহস্পতির বাঁধনছেঁড়া হয়ে দীর্ঘ উপবৃত্তাকার পথেই সূর্য-পরিক্রমা করছে।

দ্বিতীয় কথাটা হল, যাদের আমরা বৃহস্পতির পরিবারভুক্ত ধূমকেতু বলছি তারা সূর্যের মতন একটা নক্ষত্র এবং বৃহস্পতির মতন বিশাল একটা গ্রহের কাছ দিয়ে বার বার করেই ঘুরপাক খায়। এর ফলে সূর্য এবং বৃহস্পতির প্রবল অভিকর্ষবলের প্রভাব এরা এড়াতে পারে না। অভিকর্ষের জোর সময় সময় এত তীব্রতর হয়ে ওঠে যে তখন এই সব ধূমকেতুদের গতিবেগ আকস্মিকভাবেই দেখা যায় খুব বেড়ে গিয়েছে। এর সঙ্গে যদি আবার শনি, ইউরেনাস ইত্যাদির মতন গ্রহ ধূমকেতুগুলোর গতিবেগ বাড়িয়ে দেয় তো আর কথাই নেই। উদ্দাম অবস্থায় ছোট পথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে
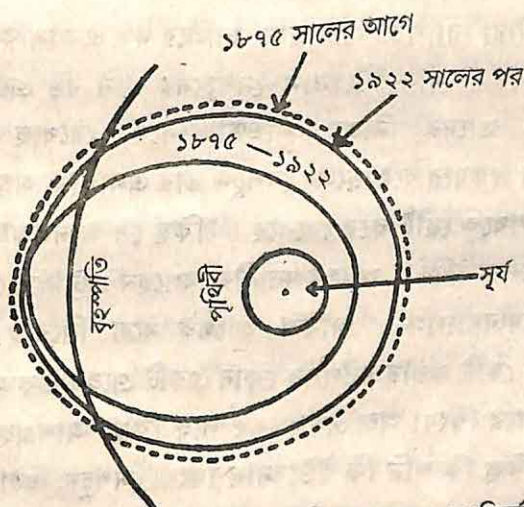
অন্য আর একটি ধূমকেতু, Comet Wolf-এর কক্ষপথ পরিবর্তন

ধূমকেতুটা তখন পরাবৃত্তাকার বা অধিবৃত্তাকার পথে ছুটতে থাকবেএবং সমস্ত গ্রহদের এলাকা থেকে উধাও হয়ে যাবে। তখন এদের আর সূর্য-

পরিক্রমার তেমন সম্ভাবনা থাকে না। তৃতীয়তঃ, বৃহস্পতির কাছে যেসব ধূমকেতুদের থাকতে হয়েছে হয়তো দেখা গেল তাদের কক্ষপথ যেমনটা ছিল সেরকম আর নেই। প্রথমে বেশ ছোট হয়ে এল, তারপর সেই ছোট অবস্থা থেকে আগে যে-আকারের কক্ষপথ ছিল সেই অবস্থায় ফিরে গেল। কেবল ইতরবিশেষ একটু ফারাক তখন নজরে পড়ে। ৮৭ পৃষ্ঠার ছবিটা লক্ষ্য করুন, বিষয়টা পরিষ্কার হবে।

চতুর্থত, যেসব ধূমকেতুর কক্ষপথ বৃহস্পতির কক্ষপথের কাছাকাছি রয়েছে, খুব কম বছরের ব্যবধানে ঘন ঘন তাদের সূর্য-পরিক্রমা করতে হয় বলেসৌর-ঝড়, সূর্যের তাপ এবং প্রচণ্ড বিকিরণশক্তির প্রভাবেএই সব ধূমকেতুদের মধ্যেকারওনা কারও নষ্ট হয়ে যাওয়ারএকটা সম্ভাবনা থেকেই যায়। বিয়েলার ধূমকেতু (Biela) হল এর জ্বলন্ত প্রমাণ। আগে এই ধূমকেতু প্রতি ৬.৭ বছর অন্তর সূর্য-পরিক্রমা করত। কিন্তু একে আজ আর দেখা যায় না। অনেককাল হল ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

বিজ্ঞানীরা ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে মত প্রকাশ করেছেন শুধু বৃহস্পতি কেন, শনি-ইউরেনাস -নেপচুনের মতন বড় গ্রহেরাও কিছু ধূমকেতুকে তাদের নিজের আওতায় ধরে রেখেছে। বিজ্ঞানী স্ট্রোমগ্রেন একবার বলেছিলেন নেপচুন তার এলাকায় অন্তত দু-ডজন ধূমকেতুর পথকে ছোট করে রেখেছে। কিন্তু সে অনেককালের কথা। ১৯১৪ সালের উক্তি। আজ বিজ্ঞানীরা বলছেন স্ট্রোমগ্রেনের এ দাবী ছিল অনুমানসাপেক্ষ। আমরা আগেই বলে নিয়েছি ধূমকেতুর কক্ষপথকে ছোট করার ব্যাপারে কোন একটি গ্রহের একক ভূমিকাও থাকতে পারে কিংবা অন্য গ্রহও সেই সঙ্গে কিছু অংশগ্রহণও করতে পারে। কিন্তু কি শনি কি ইউরেনাস কিংবা নেপচুন, এরা প্রত্যেকেই এককভাবে তাদের এলাকায় ঠিক সংখ্যায় ক'টা ধূমকেতুকে বন্দী করে রেখেছে এ তথ্য আজও প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায় নি। এই সূত্র ধরেই আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি যদিও হ্যালির ধূমকেতুর কক্ষপথ নেপচুনের অঞ্চল অতিক্রম করে না, তাই বলে একমাত্র

নেপচুনই যে কোন এককালে এই ধূমকেতুটার আদি বিশাল আকারের কক্ষপথকে ছোট করে দিয়ে উপবৃত্তাকারে পরিণত করেছে একথাও জোর দিয়ে বলা অসম্ভব।

এবার আমরা আর এক অদ্ভুত কক্ষপথবিশিষ্ট ধূমকেতুদের কথায় আসছি। এরাও দল বেঁধে আছে এবং এদের নাম দেওয়া হয়েছে Sun-grazing অর্থাৎ সূর্য-ছোঁয়া ধূমকেতু। সূর্য-ছোঁয়া ধূমকেতুদের এমনই ধরণধারণ যে এরা সূর্যের এত নিকটবর্তী হতে পারে যে তখন সূর্য থেকে এদের অনুসূরের দূরত্ব ০°০০৫ থেকে ০°০০৯ জ্যোতিষীয় এককের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। সাধারণত ধূমকেতুরা সূর্যের এত কাছে আসে না। সময় সময় আবার এমনও হয় কোন কোন সূর্য-ছোঁয়া ধূমকেতু সূর্যের একেবারে কিরীটমণ্ডলের (corona) মধ্য দিয়ে নির্বিবাদে পথ করে নিয়ে পার হয়ে যায়। বলা চলে যেন সূর্যের পৃষ্ঠভাগ ছুঁয়ে গেল। এখানেই সূর্য-ছোঁয়া ধূমকেতু নামের সার্থকতা।

সূর্য-ছোঁয়া বা Sun-grazing ধূমকেতুদের আরও একটা নামে অভিহিত করা হয়েছে। ক্রেউট্‌স্ পরিবার বা Kreutz family of comets। ডাচ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্রেউট্‌স্ সাহেব প্রথম এই ধরণের ধূমকেতুর অস্তিত্বের কথা আমাদের গোচরে নিয়ে এসেছিলেন। ১৮৮৮ সালে। ক্রেউট্‌স্ খুব দক্ষ ধূমকেতু-পর্যবেক্ষক ছিলেন এবং ধূমকেতু নিয়ে অনেক কিছু চিন্তাভাবনা করে গিয়েছেন। তিনি একটা হিসেবনিকেশ করেছিলেন যে এমন অনেক ধূমকেতু আছে যারা প্রায় সমরূপ কক্ষপথ ধরে সূর্য-পরিক্রমা করে এবং এরা কেউই স্বল্পমেয়াদী (Short-period) ধূমকেতু নয়। এদের কেউ বা হল নিয়মিত ধূমকেতু, নির্দিষ্ট একটা সময়ের পরিমাপ রেখে সূর্যের কাছে আসে, তবে দীর্ঘমেয়াদী সেই পরিক্রমণ; আবার কেউ কেউ হল অনিয়মিত ধূমকেতু, অর্থাৎ কি না একবার সূর্য-সন্নিধানে আসার পর পুনরায় সূর্যের কাছে ফিরে আসবে কি না কেউই সেকথা আমরা বলতে পারি না। ইতিমধ্যে নিচের ছকটায় একটু চোখ বুলিয়ে

নেওয়া যাক। এর সাহায্যে এই সব ধূমকেতুদের সূর্য-পরিক্রমণ কাল, কক্ষপথের উৎকেন্দ্রতা ইত্যাদি নিয়ে আমাদের একটা ধারণা জন্মাবে।

ধূমকেতু	অনুসূর অতিক্রমণের সময়	পরিক্রমণকাল	উৎকেন্দ্রতা	আনতি
1668	ফেব্রুয়ারী	—	১.০	১৪৪.৩৮
1843 I	ফেব্রুয়ারী	৫১২ বছর	০.৯৯৯৯১৪	১৪৪.৩৫
1880 I	জানুয়ারী	—	১.০	১৪৪.৬৬
1882 II	সেপ্টেম্বর	৭৬১ বছর	০.৯৯৯৯০৭	১৪২.০০
1887 I	জানুয়ারী	—	১.০	১২৮.২৭
1945 VII	ডিসেম্বর	—	১.০	১৩৭.০২
1963 V	আগস্ট	১১১১ বছর	০.৯৯৯৯৫২	১৪৪.৫২
1965 VIII	অক্টোবর	৯২৯ বছর	০.৯৯৯৯১৮	১৪১.৮৫
1970 VI	মে	—	১.০	১৩৯.০৭

এবার আমরা কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে সূর্য-ছোঁয়া ধূমকেতুদের বৈশিষ্ট নিয়ে কিছু আলোচনা করব। 1880 I ধূমকেতুর কক্ষপথ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার সময় মনে হল ১৮৪৩ সালের ধূমকেতুর কক্ষপথের আকৃতির সঙ্গে এর পথের আকৃতিটা কেমন যেন মিলে যাচ্ছে। প্রথম দিকে বিজ্ঞানীদের মনে এই সন্দেহই ঘনীভূত হল ১৮৪৩ সালের ধূমকেতুই ১৮৮০ সালে প্রত্যাবর্তন করেছে। কিন্তু ১৮৮২ সালে আর একটা ধূমকেতুকে বিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষ করলেন। এবং এর কক্ষপথের আকৃতিও উপরোক্ত ধূমকেতুদের কক্ষপথের আকৃতির সঙ্গে মোটামুটি মিলে গেল। এদের প্রত্যেকেরই কক্ষপথের উৎকেন্দ্রতা (eccentricity), আনতি (inclination) ইত্যাদি বিচার করে বিজ্ঞানীরা বরং এই সিদ্ধান্তে এলেন যে ওদের একই ধূমকেতু

বলে ভাবা চলে না, ওরা প্রত্যেকই আলাদা আলাদা ধূমকেতু। এইভাবে বেশ কিছু ধূমকেতু প্রায় সমরূপ আকৃতির কক্ষপথ এবং অল্পবিস্তর একই পরিক্রমণকাল নিয়ে জোট বেঁধে এক-একটা পরিবার গড়ে তুলেছে। 1668, 1843 I, 1880 I, 1882 II এবং 1887 I ধূমকেতুদের এক জোট করে এই রকম একটা সূর্য-ছোঁয়া ধূমকেতু পরিবারের কথা আমরা ভাবতে পারি। অবশ্য পরে আরও ধূমকেতু এই দলে সংযোজিত হয়েছে।
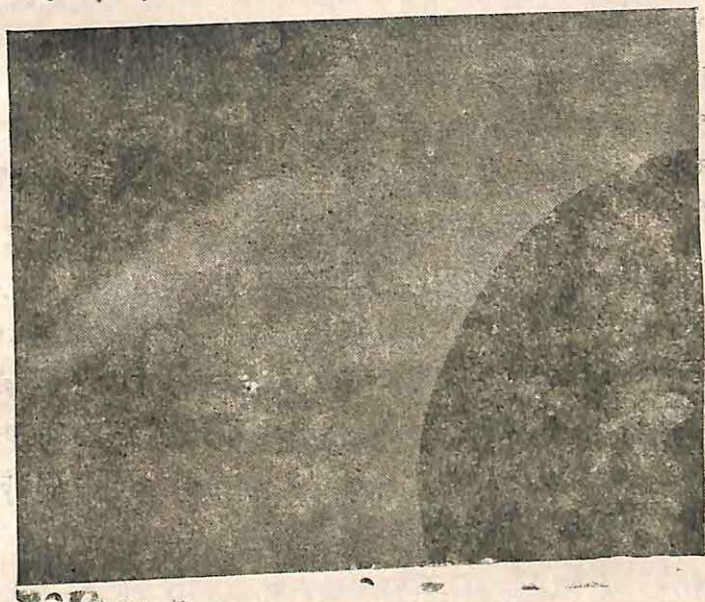
সূর্য-ছোঁয়া Ikeya-Seki ধূমকেতু

ক্রেউট্‌স্ বলেছিলেন 1882 II ধূমকেতুটা সূর্যের অনুস্থরস্থান অতিক্রম করার সময় সূর্যের এত অল্প নাগালের মধ্যে চলে এসেছিল যে সূর্যের প্রচণ্ড প্রভাবে এর দেহ আর আস্ত থাকে নি, ভেঙে চার ভাগে ভাগ হয়ে যায় কিন্তু এরা কেউই বিনষ্ট হয়ে যায় নি, সূর্য-পরিক্রমা এরা অব্যাহত রেখেছিল। ক্রেউট্‌স্ মূল 1882 II ধূমকেতু থেকে নতুন সৃষ্টিতে উদ্ভূত চার ধরণের ধূমকেতুর সূর্য-পরিক্রমার কাল গণনা করেছিলেন। হিসেব পেয়েছিলেন ৬৬৪ বছর, ৭৬৯ বছর,

৮৭৫ বছর এবং ৯৫৯ বছর। এমন কিছু মারাত্মক রকমের পার্থক্য এখানে ধরা পড়ছে না।

কিন্তু সূর্য-ছোঁয়া ধূমকেতুদের ভালভাবে আকাশে দেখার ব্যাপারে বেশ কিছু সমস্যা আছে। পৃথিবী তার কক্ষপথ ধরে সূর্যের চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। মে মাসের মাঝামাঝি থেকে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সূর্য সাপেক্ষে পৃথিবী এমন একটা অবস্থানে থাকে যে তখন এদের মধ্যে অনেকগুলোকে আকাশে দেখার ব্যাপারে অসুবিধের সৃষ্টি হয়। তখন এরা দিনের আকাশে থাকে। ধূমকেতুগুলোর মধ্যে আকারে যারা বেশ ছোট তাদের তো ঝলমলে সূর্যের আলোয় খুঁজে বের করা দুঃসাধ্যের ব্যাপার হয়ে পড়ে। এই ধরণের বাধা অতিক্রম করার জন্য বিজ্ঞানীরা একটা মুহূর্তের সন্ধানে থাকেন। সেটা হল পূর্ণ সূর্য-গ্রহণ। পূর্ণ-গ্রহণের সময় সূর্যের উপরিভাগ অর্থাৎ আলোকমণ্ডল (Photosphere) প্রায়-অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। বর্ণচ্ছটা (Chromosphere) বাদ দিয়ে চারপাশের অঞ্চলেও তখন আলো স্তিমিত হয়ে আসে। সেটাই হল অনুকূল সময়। সূর্য-ছোঁয়া ধূমকেতু তখন চোখের সামনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু সূর্য-গ্রহণের স্থায়িত্ব আর কতটুকু? অল্প সময়ের মধ্যেই ধূমকেতু দেখার কাজটা সেরে ফেলতে হয়। তাতে কাজটা তেমন ভালমতো এগোয় না।

১২

ধূমকেতুর নাম রাখার পদ্ধতি

আগের অধ্যায়গুলোয় ধূমকেতুর কথা আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের এমন অনেক ধূমকেতুর নাম করতে হয়েছে যেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নামই যে ব্যবহার করা হয়েছে তা নয়, অন্যভাবেও ধূমকেতুদের সনাক্তকরণের একটা পদ্ধতি পালিত হচ্ছে। যেমন, 1880 I, 1965 VIII ইত্যাদি। এই বিষয়টার সঙ্গে আমাদের এখন একটু পরিচিত হয়ে নেওয়া ভাল। কারণ ধূমকেতু সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা ক্রমশই এগিয়ে চলেছে, ইতিমধ্যে বিষয়টা সম্বন্ধে পরিষ্কার একটা ধারণা না থাকলে বোঝার ব্যাপারে আমাদের বিভ্রান্তি বাড়তে পারে।

সাধারণ প্রচলিত নিয়ম হল যিনি প্রথম নতুন কোন ধূমকেতু আবিষ্কার করবেন তাঁর নামেই সেই ধূমকেতুর নামকরণ করা হবে। যেমন, Comet Stearns, Comet Holmes ইত্যাদি। কিন্তু যদি এমন হয় নতুন কোন ধূমকেতুর আবিষ্কারক হিসেবে একজনের বেশী দাবিদারকে পাওয়া যাচ্ছে সেক্ষেত্রে দুই বা তিনজনের নামেও সেই ধূমকেতুর নাম রাখা হবে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তিনজন আবিষ্কারকের চেয়ে বেশী নাম ব্যবহার করা হবে না। যেমন, Arend Rigaux ধূমকেতু, Mitchell-Jones-Gerber ধূমকেতু ইত্যাদি।

ধূমকেতুদের নাম রাখার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থা* এই সব নিয়মকানুন ছাড়া আরও কিছু নিয়ম প্রবর্তন করেছে। যেমন, সাল এবং ইংরেজী অক্ষর a, b, c ইত্যাদি ব্যবহার করেও ধূমকেতুদের সনাক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ মনে করা যাক ১৯৪৮-

* International Astronomical Union (IAU)

সালে আমরা সর্বসমেত চারটি ধূমকেতু দেখেছি। যেমন যেমন দেখেছি সেইভাবে প্রথম, দ্বিতীয় ক্রম অনুসারে সাজিয়ে নিয়ে এগুলোকে বলা হবে Comet 1948 a, Comet 1948 b, Comet 1948 c ইত্যাদি। এই ধরণের নিয়মমাফিক কাজের একটা সুবিধে হল এতে বছরভিত্তিক ধূমকেতু-পর্যবেক্ষণের সুন্দর একটা হিসেব রাখা যায়।

তারপর একটা বছরে ধূমকেতুদের মধ্যে কে কখন সূর্যের নিকটতম দূরত্ব বা অনুসূরস্থানে এসে হাজির হল তারও একটা হিসাব রাখা দরকার। এই উদ্দেশ্যে আবিষ্কারকের নামের সঙ্গে সাল এবং রোমান সংখ্যাবাচক অক্ষর, যেমন, i, ii, iii (I, II, III) ব্যবহার করেও ধূমকেতুদের পরিচয় দেওয়ার রীতি আছে। উদাহরণ হল, Thomas 1969 I ধূমকেতু, Wild 1968 III ধূমকেতু ইত্যাদি। Thomas 1969 I-এর অর্থ হচ্ছে Thomas সাহেবের দ্বারা আবিষ্কৃত ধূমকেতু ১৯৬৯ সালে ধূমকেতুদের মধ্যে প্রথম সূর্যের অনুসূর স্থানে এসেছিল আর Wild 1968 III-র অর্থ হল ১৯৬৮ সালে অনুসূর স্থানে ধূমকেতুদের মধ্যে এর হাজিরার ক্রম ছিল তৃতীয়।

আবার এমন অনেক ধূমকেতু আছে যাদের নামের আগে আমরা ইংরেজী P অক্ষরও লক্ষ্য করব। এর অর্থ বোঝানো হয়েছে P মানে Periodic অর্থাৎ নিয়মিত ধূমকেতু। যেমন, p/Halley, p/Arend —Rigaux ইত্যাদি। যারা সময়ের বাঁধাধরা কোন হিসেব মানে না অর্থাৎ যারা অনিয়মিত ধূমকেতু, বলা বাহুল্য তাদের নামের আগে p অর্থাৎ Periodic কথাটা ব্যবহৃত হয় না।

১৩

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধূমকেতু

আকাশে আমরা যখন নক্ষত্র দেখি সে-দেখার মধ্যে তেমন বিশেষ কোন বৈচিত্র্য আমরা খুঁজে পাই না। নক্ষত্রগুলো একইভাবে আকাশে ফুটে থাকে, শুধুই ওরা চুমকির মতন ঝিকমিক করে, কেউ বা একটু বেশী উজ্জ্বল কেউ বা অনুজ্জ্বল। এর বেশী কিছু নয়। আপাতবিচারে ধূমকেতু দেখার ব্যাপারেও কোন বৈচিত্র্যের সন্ধান করা বৃথা। এক ঝলকে সব ধূমকেতুই আমাদের চোখে একই রকম মনে হয়। তথাপি খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে এদের মধ্যেও ব্যতিক্রম আছে। এমন অনেক ধূমকেতু আকাশে ওঠে সত্যিই যারা মনে দাগ কেটে যায়। এদের স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এমনি ধরণের কয়েকটি ধূমকেতু নির্বাচন করে নিয়ে তাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

খুব বেশী পুরনো দিনে ফিরে গিয়ে লাভ নেই। কারণ ধূমকেতু সম্বন্ধে খুব প্রাচীন কালের বিবরণ তেমন নির্ভরযোগ্য হয় না। তার চেয়ে বরং বিগত তিনশো বছরের একটা খতিয়ান নিলেই এ বিষয়ে মোটামুটি আমরা একটা ধারণা লাভ করতে পারব।

আঠারো শতকে আমাদের দেখা দুটো ধূমকেতু বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। একটা হল হ্যালির ধূমকেতু, আর অন্যটা হল Klinkenberg Comet। হ্যালির ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল ১৭৫৯ সালে আর ক্লিনকেনবের্গ ধূমকেতু দৃশ্যগোচর হয়েছিল ১৭৪৩ সালে। তবে হ্যালির ধূমকেতুর নামটা শুধু আমরা উল্লেখ করলাম, নতুন করে এখানে আর কিছু বলার নেই। ক্লিনকেনবের্গ ধূমকেতু হ্যালির ধূমকেতুর মতন আকারে অবশ্য অত বড় ছিল না, কিন্তু তার রূপের ছটার কোন তুলনাই হয় না, এত চমৎকার দেখতে ছিল। ১৭৪৩ সালের ৯ই

ডিসেম্বর তারিখে হারলেম থেকে ক্লিনকেনবের্গ এটিকে আবিষ্কার করেছিলেন তার ঠিক কয়েক দিন পরেই ১৩ তারিখে ল্যসান থেকে দ্য শেসো (De Che´seaux) এটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ক্লিনকেনবের্গ ই যে প্রকৃত আবিষ্কারক একথা অনেকেই ভুলে গিয়েছেন, ধূমকেতুটার পরিচিতি হয়েছে De Che´seaux Comet বলে। কিন্তু এটা ঠিক নয়।

যাইহোক, ক্লিনকেনবের্গ অথবা দ্য শেসো এঁরা দুজনেই একই সুরে ধূমকেতুটা সম্বন্ধে বৃত্তান্ত লিখে গিয়েছেন। এর মাথার অংশটা হ্যালির ধূমকেতুর চেয়েও অসাধারণ ঝকঝকে উজ্জ্বল দেখাত। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এর পুচ্ছভাগ। অদ্ভুত, অনন্যসুন্দর এবং এক কথায় বিরল। একটা অংশ নিয়ে লেজটা গড়ে উঠে নি, কিন্তু দুটি প্রধান ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। তারই মাঝে-মাঝে এপাশে-ওপাশে আরও পাঁচটি লেজের মতন অংশ সংযোজিত হয়েছিল। সব মিলিয়ে এগারোটি পুচ্ছ। মনে হত আকাশের গায়ে ময়ূর যেন পেখম মেলে আছে। ধূমকেতুর ক্ষেত্রে এমন দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে

উঠছে এ যেমন ভাবাও যায় না, ভাষায়ও বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু আমাদের পরম দুর্ভাগ্য এমন অসাধারণ সুন্দরএকটা কতুকে ধূমআমরা

আর দেখতে পাব না। এটা অনিয়মিত ধূমকেতু, এর পরিক্রমণকাল আজও নির্দ্ধারিত হয় নি।

আঠারো শতকের পর উনিশ শতকে দেখা গেল যতগুলো ধূমকেতু আমরা দেখেছি তাদের মধ্যে 1861 II নামে ধূমকেতুটা বিশেষ একটা খ্যাতি অর্জন করেছে। সেটা যখন আকাশে উঠত তখন মনে হত চাঁদের মোলায়েম আলোয় আকাশ ভরে গিয়েছে। আকারে যত বড় ধূমকেতুই হোক এমনিতে সে একটু নিষ্প্রভ হবেই। সে ক্ষেত্রে ধূমকেতু চাঁদনী রাতের মতন আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে এ দৃশ্য যেন ভাবাই যায় না। কিন্তু এর কথা আমরা কানে শুনেই রাখলাম, ভাগ্যে আর কোন দিন চাক্ষুষ একে দেখতে পাব এমন আশা করতে পারি না। কারণ এটাও হল একটা অনিয়মিত ধূমকেতু। সেই যে একবার সূর্যকে দেখা দিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে, আর কোনও দিন সূর্যের কাছে ফিরে আসবে না।

এই শতাব্দীতেই আর একটা উল্লেখযোগ্য ধূমকেতুর শেষ পরিণতি আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। সেটা হল বিয়েলার (Biela) ধূমকেতু। খুব পরিচিত নাম। এককালে বার বার করেই মাত্র ৬·৬২ বছর অন্তর এই ধূমকেতুটা সূর্যের কাছে ঘুরেফিরে আসত। অল্প সময়ের ব্যবধানে হাতেকলমে এই ধূমকেতু সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ তখন কত সহজ ছিল। কিন্তু ১৮৪৫ সালে বিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষ করলেন ধূমকেতুটা ভেঙ্গে দু-খণ্ড হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন ধূমকেতুটা তাহলে বোধহয় ধ্বংসই হয়ে গেল, ভবিষ্যতে আর কোনদিন তাকে দেখা যাবে না। কিন্তু ১৮৫২ সালে দ্বিখণ্ডিত ভগ্ন অবস্থাতেই ধূমকেতুটা আকাশে আবার আবির্ভূত হল। তারপর সাড়ে ছ-বছর অন্তর দুটো সময়কাল পার হয়ে গেল, কিন্তু বিয়েলার ধূমকেতু আকাশে আর দেখা দিল না। ইতিমধ্যে আবার সাড়ে ছ-বছর অতিক্রান্ত হল। অর্থাৎ ১৮৭২ সাল এসে হাজির হল। তখন আকস্মিকভাবে পৃথিবীতে কিছু উল্কাবর্ষণ হল। ঠিক বিয়েলার ধূমকেতু যে-পথ ধরে সূর্য-পরিক্রমা করত সেই পথ থেকে।

বিজ্ঞানীরা বুঝলেন বিয়েলার ধূমকেতু আর দ্বিখণ্ডিত অবস্থাতেও নেই, আরও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে, উল্কাবর্ষণই হল সেই ধূমকেতুটার ধ্বংসাবশেষ। একটা ধূমকেতুর অন্তিম পরিণতি যে কী হতে পারে বিয়েলার ধূমকেতু তারই ইঙ্গিত দিয়ে গেল।

কিন্তু শুধু বিয়েলার ধূমকেতু নয়, আরও এমন অনেক ধূমকেতু আছে যারা হয় একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, না হয়তো এখন তাদের ভগ্নদশা চলেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Olinda Comet 1860 I, Sungrazing Comet 1882 II, 1889 V, 1889 I 1906 IV, 1915 II, 1915 IV, 1916 I, 1947 XII, 1951 II, 1955 V, 1957 VI, Ikeya-Seki 1962 VIII ইত্যাদি ধূমকেতু।

আবার উনিশ শতকের কথায় আসছি। এই শতকেই, ১৮৮২ সালে, প্রসিদ্ধ ধূমকেতু পর্যবেক্ষক বার্নার্ড (Barnard) যে ধূমকেতুটাকে দেখেছিলেন তার সম্বন্ধে তিনি যে-বিবরণ দিয়ে গিয়েছেন তার চাঞ্চল্যকর তথ্যে আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি।

'I ran upon a very cometary looking object when there was no known nebula. Looking more carefully I saw several others in the field of view. Moving the telescope about I found that there must have been 10 to 15 Comets at this point within the space of a few degrees. The observations were amply verified both in the states and in Europe, by other observers who saw some of these bodies. Unquestionably they were a group of comets or fragments that had been disrupted from the great comet, perhaps when it whirled round the sun and grazed its sarface several weeks earlier with the speed of nearly four hundred miles a second."

এবার বর্তমান শতকের কথায় আসা যাক। বিগত ১৯১০ সালে

দেখা হ্যালির ধূমকেতুর কথা আমার বলছি না। এই বছরেই হ্যালির ধূমকেতু দেখা দেওয়ার আগেই আর একটা খুব নামকরা ধূমকেতু (1910 I) আকাশে দৃশ্যমান হয়েছিল। এই ধূমকেতুটারও অদ্ভুত প্রকৃতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এর অন্তত তিনটে লেজ গড়ে উঠেছিল। প্রধান পুচ্ছভাগটা ভীষণ উজ্জ্বল দেখাত এবং আকাশে প্রায় ৩০°-র মতন স্থান অধিকার করে থাকত। দ্বিতীয় লেজটা ছিল ছোট। আর তৃতীয় লেজটার বৈশিষ্ট ছিল সেটা সূর্যের বিপরীত দিকে গড়ে না উঠে সূর্যমুখো হয়েই বেড়ে উঠেছিল। কিন্তু সমস্ত পুচ্ছভাগের গ্যাসীয় অংশ থেকে অদ্ভুত ধরণের একটা হলুদ দীপ্তি আকাশকে ভরিয়ে তুলেছিল।

১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল, এই বছরের মধ্যে অনেকগুলো ধূমকেতু ছিল যারা হল সূর্য-ঘেঁষা ধূমকেতু, যেমন, ১৯৬৩ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে কম করে অন্তত চারটি এই ধরণের ধূমকেতু আমাদের নজরে এসেছে। শুধুমাত্র সূর্য-ছোঁয়া ধূমকেতু বলে এদের আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি তা নয়, ধূমকেতু হিসেবে এদের প্রত্যেকেরই বিশেষ একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এদের প্রত্যেকেরই ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি দেহ, অথচ এদের বিস্ময়কর ঔজ্জ্বল্য, এদের অস্বাভাবিক গতিবেগ, এদের বর্ণালী-সমাহারে সোডিয়াম, সায়ানোজেন ইত্যাদির অস্তিত্ব আবিষ্কার, সূর্যের একান্ত সান্নিধ্যে আসা সত্ত্বেও এদের পুচ্ছদেশ উৎপন্ন না হওয়া, অথচ এদের নিউক্লিয়াসেরও অটুট অবস্থা বজায় রাখা, সব মিলিয়ে জাতে ধূমকেতু হলেও বর্ণ-গোত্র-পরিবারের পরিচয়ে ধূমকেতু যে কত বিচিত্র, কত বহুমুখী স্বভাবের হতে পারে সেটাই আজ বিজ্ঞানীরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন।

বর্তমান শতাব্দীতে মোরহাউস (Morehouse) ধূমকেতু (1908 III) এবং কোহুতেক (Kohoutek) ধূমকেতুর (1970 III) কথাও ভোলার নয়, বিশেষ করে মোরহাউস ধূমকেতু ছিল অসাধারণ অদ্ভুত এক ধূমকেতু। প্রথম প্রথম মোরহাউস ধূমকেতু যখন আকাশে

উঠত তখন তাকে বেশ বড়সড়ও দেখাত, উজ্জ্বলও দেখাত। একটাই তার প্রধান লেজ তখন তৈরী হয়েছিল, কিন্তু কয়েক দিন পার হতে না হতেই তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন চোখে পড়তে লাগল। দেখা গেল সেই পুচ্ছদেশ মাথার অংশ থেকে খানিকটা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে আবার মাথার অংশটাও দ্বিখণ্ডিত হয়ে এল, কিন্তু তাই বলে তারা দূরে দূরে ছিটকে পড়ল না, কাছাকাছিই প্রায় একরকম জড়ো হয়েই সূর্য-পরিক্রমা করতে লাগল। এইবার আগেকার মুখ্য লেজটাও আর উজ্জ্বল রইল না, ক্রমশই তার সব দীপ্তি মিলিয়ে গেল। তার জায়গায় নতুন করে আর একটা লেজ গজিয়ে উঠল।

আর কোহুতেক ধূমকেতুর আগমন উপলক্ষ্যে তো যথেষ্ট ঢাকঢোল পেটানো হয়েছিল। এর জন্য অবশ্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। বৃহস্পতির দূরত্বে যখন ধূমকেতুটা এসে হাজির হয়েছিল তখনই সেটা আমাদের নজর কেড়ে নিয়েছিল। অবশ্য তখন তার লেজ গজায় নি এবং এই অত দূরে ধূমকেতুদের তেমন লেজ গজাবার কথা নয়। কিন্তু ধূমকেতুটার চমৎকার দীপ্তিটা ধরা পড়ে গিয়েছিল। এবং বলার অপেক্ষা রাখে না সেটা ছিল তার মাথার অংশ। এর থেকেই আমাদের ধারণা জন্মেছিল এই ধূমকেতু সূর্যের আরও কাছে যখন এগিয়ে আসবে তখন তার পুচ্ছভাগ নিশ্চয়ই দর্শনীয়ভাবে গড়ে উঠবে এবং ধূমকেতুটা একটা খুব বড় আকারের বলেই প্রমাণিত হবে। কিন্তু কোহুতেক ধূমকেতু অমোদের আশা পূর্ণ করতে পারে নি। সূর্যের নিকটবর্তী হওয়ার সময়েও তার ভালোমত পুচ্ছভাগ গজিয়ে উঠতে দেখা যায় নি। হালকা ধূসর বর্ণের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মতন খুব ছোটখাট একটা লেজই কেবল চোখে পড়ত। তবে বিজ্ঞানীদের অভিমত এককালে কোহুতেক ধূমকেতুর খুব বড় আকারেই লেজ গজাত, কিন্তু এখন এর ভগ্নদশা চলেছে, সমস্ত মালমশলাই একরকম নিঃশেষিত হয়ে এসেছে।

১৪

ধূমকেতুর সৃষ্টি ও তার উৎসস্থান

বিজ্ঞানীরা একবার প্রশ্ন তুলেছিলেন ধূমকেতুরা বিশাল আকৃতির পরাবৃত্ত বা অধিবৃত্ত পথে ঘোরে কেন? কারণটা কী?

তাহলে কি মনে করতে হবে এমন একটা জায়গায় ধূমকেতুদের আস্তানা গড়ে উঠেছে যে-স্থান সূর্য থেকে প্লুটোরও সীমানা পার হয়ে দূরে, আরও দূরে অবস্থিত এবং সেই অস্বাভাবিক দূরত্ব থেকে ধূমকেতুরা যাত্রা করে বলেই কি তাদের পথ পরাবৃত্তাকার হয়েছে?

এই বিষয়ের উপরেই আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর, আগে ১৯৫০ সালে ডাচ জ্যোতির্বিজ্ঞানী য়ান অর্ট্ (Jan Oort) আলোকপাত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল আনকোরা নতুন যেসব ধূমকেতু প্রথম যখন সৌরমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন তারা বিশাল আকৃতির কক্ষপথ ধরেই সূর্যের কাছে আসতে থাকে। শুধু তাই নয়, সৌরমণ্ডলের গ্রহেরা যেভাবে প্রায় একই সমতলে সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে, ধূমকেতুদের কক্ষপথ এই সমতলে নেই, বরঞ্চ একরকম বলতে গেলে প্রায় সব ধূমকেতুই ক্রান্তিবৃত্তের (ecliptic অর্থাৎ অন্য বিশেষণে বলা চলে পৃথিবীরই কক্ষপথ) সমতল ছেদ করে যায় এবং উত্তর বা দক্ষিণ দিকে চলে যায়। এই জন্যই এক-একটা ধূমকেতু সূর্যের কাছে আসতে এত দীর্ঘ সময় নেয় এবং তারা যে-কোন দিক থেকেই পৃথিবীর আকাশে আবির্ভূত হতে পারে। এই কারণেই ধূমকেতুরা যে সূর্যের কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে আসতে পারে না অরটের এই রকম একটা ধারণা জন্মাল। প্রসঙ্গত অর্ট্ তাঁর ধারণাকে আরও সুসংবদ্ধ করার জন্য কিছু দীর্ঘমেয়াদী কিন্তু নিয়মিত ধূমকেতুর কক্ষপথ বিশ্লেষণ করলেন। তাঁর কাছে সমস্যাটা

পরিষ্কার হয়ে এল যে বহু দীর্ঘমেয়াদী ধূমকেতুর কক্ষপথের পরাক্ষ (Major Axis) সূর্য থেকে ৫০,০০০ থেকে ১৫০,০০০ জ্যোতিষীয় একক দূরবর্তী কোন স্থানে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। গাণিতিক এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেই অর্‌ট্‌ প্রস্তাব করলেন ধূমকেতুদের আদি আস্তানা তাহলে সূর্য থেকে ৫০,০০০ থেকে ১৫০,০০০ জ্যোতিষীয় একক দূরত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। অর্থাৎ তিনি বলতে চাইলেন সূর্য থেকে এক অকল্পনীয় দূরত্বে সূর্যের চারপাশে একটা বেষ্টনীর মতন স্থান করে নিয়ে ধূমকেতুরা তাদের সৃষ্টির সময় থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে থরে থরে তাদের আদি দেহ অর্থাৎ গোলাকার মাথার অংশটা নিয়ে জমা হয়ে আছে। সূর্য নিজে যেমন স্থির নয়, আবর্তিত হচ্ছে, বেষ্টনীর আকারে ধূমকেতুর এই ঝাঁকটাও আবর্তিত হচ্ছে। এই হল ধূমকেতুর উৎসস্থান বা অন্য কথায় তার সৃষ্টিক্ষেত্র বা creation-field।

অরটের ধারণা অনুযায়ী সূর্য থেকে ৫০,০০০ কিংবা ১৫০,০০০ জ্যোতিষীয় একক দূরে ধূমকেতুর উৎসস্থলের কথা ভেবে নিলে ধূমকেতুদের কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার বছর অন্তর অধিবৃত্তাকার কিংবা পরাবৃত্তাকার পথে সূর্যকে একবার বেড় দিয়ে যাওয়ার কারণটা আঁচ করতে পারা যায়। কিন্তু একটা প্রশ্ন বাকি থেকে যায় ধূমকেতুরা সূর্য থেকে অত অস্বাভাবিক দূরত্বেই বা গড়ে উঠল কেন, গ্রহগুলো যেসব জায়গায় রয়েছে সেখানেও তো ধূমকেতুগুলো গড়ে উঠতে পারত? কিন্তু তা হয় নি কেন?

খুবই জটিল প্রশ্ন। এক কথায় এর উত্তর দেওয়া অসম্ভব। গোটা সৌরমণ্ডলের উৎপত্তির বিষয়টা এর সঙ্গে যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে, সেই সঙ্গে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনার গুরুত্ব আছে। অবশ্য সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি এবং বিবর্তনের ইতিহাস সে এক বিরাট কাহিনী। নানা বিজ্ঞানীর নানা মত। কোন্ মতটা যে ঠিক এই নিয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছন আজও সম্ভব হয় নি। এসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করারও অবকাশ

বর্তমান প্রসঙ্গ নয়। শুধুমাত্র আলোচনার স্বার্থে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই আমরা বর্ণনা করব।

আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে (১৭৯৬ সালে) ফ্রান্সের বিজ্ঞানী লাপ্লাস (Laplace) সৌরমণ্ডলের উৎপত্তিগত কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন কোন এক সময় জলন্ত গ্যাসের পিণ্ড অর্থাৎ আদি নীহারিকা ধীর গতিতে কেবলই আবর্তিত হচ্ছিল। এই অবস্থায় সূর্যের যখন সৃষ্টি হল অর্থাৎ সে যখন proto sun বা তার যখন শৈশবব্যবস্থা চলছে তখন সূর্য ছিল আকারে আরও প্রকাণ্ড এবং অতিমাত্রায় উষ্ণ, তার ভিতরের গ্যাসীয় সমাহার এখনকার মতো এত ঘনসংবদ্ধ অবস্থায় ছিল না, বরঞ্চ কিছু পাতলা এবং অসংলগ্ন অবস্থায় ছিল। যাই হক, পরে যখন এই সৌর-নীহারিকা আরও শীতল হয়ে এল, সংকুচিত হল, তখন তার এই আবর্তিত অবস্থায় তার দেহ থেকে আরও দু'টো-একটা বলয় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং এইভাবে সেই বলয় ক্রমশই গ্রহ-উপগ্রহে রূপান্তরিত হয়েছিল। আপাতবিচারে লাপ্লাসের সৌর-নীহারিকাবাদ (Solar-nebular theory) ভারী প্রাঞ্জল এবং চমৎকার বিবেচিত হবে, যেন মনে ধরে যায়। কিন্তু গাণিতিক বিচারে এর মধ্যে প্রচুর ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। একটা সহজ কথা বলা যাক। আজ সূর্য যে-গতিবেগে একবার আবর্তিত হচ্ছে আদিতে বিশালায়তন সৌর-নীহারিকা নিশ্চয়ই সেই গতিতে ঘুরত না, খুবই মন্থর গতিতে ঘুরত। তাহলে? ধীর বেগে আবর্তিত হতে থাকলে সৌর-নীহারিকার গ্যাস কীভাবে ছিটকে পড়ে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি করতে পারে? লাপ্লাস ব্যাখ্যা করেন নি কীভাবে আদি বিশাল নীহারিকায় গতি সঞ্চারিত হয়েছিল। গণিতে কৌণিক ভরবেগের নিত্যতা সূত্র নামে (principle of conservation of angular momentum) ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আছে। এই সূত্র বলে অক্ষ থেকে গতিযুক্ত কোন বস্তুর দূরত্ব যেমন যেমন বাড়বে বা কমবে সেই অনুযায়ী বস্তুর গতিবেগও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে বা হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু গতিবেগের সঙ্গে দূরত্বের

হ্রাসবৃদ্ধির এমনই একটা আনুপাতিক হার বজায় থাকে যে কৌণিক ভরবেগ বদলায় না, সব সময় অপরিবর্তিত থাকে। লাপ্লাসের মতবাদ কৌণিক ভরবেগের নিত্যতা সূত্র অগ্রাহ্য করে বলেই সৌর-নীহারিকাবাদ আজ বাতিল হয়ে গিয়েছে। বাস্তবিক লাপ্লাস যেভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তাঁকে অনুসরণ করে সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি বোঝা যেমন অসম্ভব, তেমনি তাঁর বর্ণিত সৌর-নীহারিকাবাদের ভিত্তিতেও ধূমকেতুর সৃষ্টি বোঝা সম্ভব নয়।

বরঞ্চ লাপ্লাসের বিকল্প হিসেবে সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি সংক্রান্ত ভাইৎসস্যাকেরের (Weizsacker) মতবাদ আমাদের অনেক বেশী যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়। ভাইৎসস্যাকের বলেছিলেন সূর্য সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরও সদ্যজাত সূর্যের চারদিকে মহাশূণ্যের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত গ্যাসীয় অণু এবং সূক্ষ্ম ধূলিকণা শুধু যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নিশ্চল অবস্থায় পড়ে ছিল তা নয়, সূর্যের চারিদিকে একটা মহাকর্ষীয় শক্তি কাজ করছিল যে এরা ক্রমাগত আবর্তিতও হচ্ছিল। এই যে আবর্তন এর ফলে গ্যাসীয় অণু এবং ধূলিকণার মধ্যে পারস্পরিক একটা ঘর্ষণ ও সংঘর্ষ লেগেই থাকত। নিজেদের মধ্যে এই ধরণের ক্রমাগত একটা অস্থিরতা এবং ধাক্কাধাক্কির ফলে এই সব গ্যাসীয় অণু এবং ধূলিকণা এরা প্রত্যেকেই অনেক সময়েই নিজের নিজের কক্ষপথ ছেড়ে অন্যের কক্ষপথে ভিড়ে যেত। এইভাবে ধীরে ধীরে এদের পথ প্রায়-বৃত্তাকার হয়ে আসে এবং সূর্যের নিরক্ষরেখার সঙ্গেও সমতলীয় হয়ে ওঠে। অবশেষে সূর্যের চারধারে বিশাল একটা গ্যাসীয় চাকতি গড়ে ওঠে। ঘূর্ণায়মান সেই গ্যাসীয় চাকতি তখন সূর্য থেকে কিছু তাপও গ্রহণ করছে, আবার প্রয়োজনমতো বর্জনও করছে। এই ধরণের সাম্যাবস্থার মধ্যে চাকতিটার উপর ইতিমধ্যে সান্দ্র বলের (viscous force) প্রভাবে তার ভিন্ন ভিন্ন অংশের কৌণিক বেগও (angular velocity) সমান হয়ে আসতে লাগল। অতঃপর অন্তিম অবস্থা ঘনিয়ে এল। গ্যাসীয় অংশের যে যে স্থানের গতি যেমন কমে এল তখন তখন তারা দলা পাকিয়ে এক-একটা

পিণ্ডের মতন হয়ে গ্রহরূপে সূর্যের ক্রমশই নিকটবর্তী হতে লাগল, আর যে যে জায়গায় গতি যেমন যেমন বাড়তে লাগল তারা গ্রহ হিসেবে ততই সূর্য থেকে দূরবর্তী হতে লাগল। এইভাবে বুধ থেকে প্লুটো পর্যন্ত সৌরমণ্ডল বিস্তৃত হয়ে রইল।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে লাপ্লাসের তত্ত্বের মাধ্যমে সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি হক কিংবা ধূমকেতুর সৃষ্টি হক এর কোনটারই সঠিক কারণ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, কিন্তু পক্ষান্তরে ভাইৎসস্যাকেরের মতবাদ অনুসারে সৌরমণ্ডলের উৎপত্তির ব্যাপারটা বোঝা যায়। তথাপি এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীরা একটা প্রশ্ন তুলতে চেয়েছেন যে ভাইৎসস্যাকেরের তত্ত্ব সৌরমণ্ডলের গ্রহদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও এই ধূমকেতুর উৎপত্তি সম্বন্ধে যথাযথ ব্যাখ্যা কি তুলে ধরে? অর্থাৎ গ্রহেরা সূর্যের নিরক্ষরেখার সঙ্গে প্রায়-সমতলীয় অবস্থায় আছে এবং গ্রহ-উপগ্রহ সংখ্যায় অত্যল্প। কিন্তু Oort cloud অঞ্চলে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি ধূমকেতু আছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। তাহলে কি এরা সূর্যের নিরক্ষরেখার সঙ্গে সমতলীয় অবস্থায় থাকতে পারে? এবং শুধু তাই নয়, গ্রহ-উপগ্রহদের মতন একটা চ্যাপটা গ্যাসীয় চাকতি থেকেও কি এত বিপুল সংখ্যায় ধূমকেতুর সৃষ্টি হতে পারে?

এই সব জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বিজ্ঞানীরা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ধূমকেতুর সৃষ্টি, তার উৎসস্থল ইত্যাদি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতেও বাধ্য হচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের নিজস্ব নক্ষত্রজগতের galaxy-র কথা আমরা একটু ভাবতে পারি। বলার অপেক্ষা রাখে না আপনারা নিশ্চয়ই জানেন মহাশূন্যে অসংখ্য নক্ষত্রজগৎ আছে এবং প্রত্যেকটি নক্ষত্রজগতে কোটি কোটি নক্ষত্র রয়েছে। মোটামুটি একটা হিসেব অনুসারে আমাদের নক্ষত্রজগতে প্রায় দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের সন্ধান করা সম্ভব হয়েছে। আকৃতিতে আমাদের নক্ষত্রজগৎ অনেকটাই পাকানো কুণ্ডলীর মতো, আর তার মাঝখানটা একটু ফোলা, যেন একটা মালপোয়ার মতন। আমাদের

এই নক্ষত্রজগৎ তার অন্তর্গত যাবতীয় নক্ষত্র নিয়ে নিয়তই আবর্তিত হচ্ছে এবং যেহেতু সূর্য এর কেন্দ্র থেকে ৩০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে, অতএব সূর্যও তার সঙ্গীসাথী নিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে ২০০ কিলোমিটার বেগে আবর্তিত হচ্ছে এবং নক্ষত্রজগতের চারপাশে একবার পরিক্রমণের জন্য সময় নিচ্ছে প্রায় ২৫ কোটি বছর।

আমাদের নক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধে এই পর্যন্ত অতি সংক্ষেপে কিছু কথা আমরা উল্লেখ করলাম। এখন প্রসঙ্গত অন্য আর একটা বিষয় বিবেচনা করা যাক। একটা সময় ছিল যখন আমরা মনে করতাম আন্তর্নাক্ষত্র পরিমণ্ডল (interstellar region) অর্থাৎ নক্ষত্রদের মধ্যবর্তী জায়গাটা নিতান্তই ফাঁকা, বস্তুহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ চালানো হয়েছে, বিশেষ করে অণুতরঙ্গ জ্যোতির্বিজ্ঞানের (microwave astronomy) মাধ্যমে যেসব গবেষণা-অনুসন্ধান চালানো হয়েছে তার সাহায্যে একটা বিষয় আজ আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে এসেছে যে মহাশূন্যে, নক্ষত্রদের মাঝে পদার্থের মৌল কণিকা কোথাও বা স্বাধীনভাবে, কোথাও বা রাসায়নিক যৌগরূপে ছড়িয়ে রয়েছে। সুদূর আন্তর্নাক্ষত্র পরিমণ্ডলে রাসায়নিক যৌগের যে অস্তিত্ব আছে এ ব্যাপারে সোভিয়েত জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্কেলভস্কি বিশেষভাবে প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। যাইহোক, মহাশূন্যের এখানে-ওখানে এইভাবে পদার্থের কণিকা মহাজাগতিক মেঘের (বা যাকে অন্য অর্থে নীহারিকা বা nebula-ও বলা চলতে পারে) রূপ নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে এবং স্থানে স্থানে প্রচণ্ড ঘূর্নিবাত্যার মতন পরিস্থিতি গড়ে তুলেছে। উপাদান হিসেবে এদের মধ্যে হাইড্রোজেন তো আছেই, এমন কি কিছু ভারী মৌলিক পদার্থও রয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই এই সব মহাজাগতিক মেঘের ভর এবং আকর্ষণ সাংঘাতিক রকমের প্রবল বলে ধারণা করা হয়েছে।

এখন, আবার সূর্যের প্রসঙ্গ তোলা যাক। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি সূর্য আমাদের নক্ষত্রজগতের কেন্দ্রের চারপাশে

আবর্তিত হচ্ছে। এই ভাবে সূর্য তার পথ ধরে আবর্তন করার সময় এমনও হতে পারে যে তার পক্ষে কোনও না কোন মহাজাগতিক মেঘের সংস্পর্শে আসা সম্ভব এবং কিছু বিজ্ঞানীদের ধারণা এই অবস্থায় সূর্য অতীতে এই সব মহাজাগতিক মেঘের কিছু অংশ ছিনিয়ে নিয়েছিল। কালক্রমে মহাজাতিক মেঘ থেকে বিছিন্ন অংশগুলো সূর্য থেকে ৫০,০০০/১৫০,০০০ জ্যোতিষীয় একক দূরবর্তী স্থানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে অদ্ভুত আকারে পিণ্ডের মতন ধূমকেতু হয়ে গড়ে উঠেছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায় ধূমকেতুর সৃষ্টি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের এই যুক্তি বড় দুর্বল। কারণ এখানে দুটো সমস্যা আছে। এগুলোর সমাধান দরকার। এক হল বিজ্ঞানীরা যে দাবীটা করেছেন কোন এক সময় একটা মহাজাগতিক মেঘ থেকে সূর্য কিছুটা অংশ ছিনিয়ে নেওয়ার ফলে ধূমকেতুর সৃষ্টি হয়েছিল সেক্ষেত্রে একটা কথা জানা আবশ্যক যে তুলনামূলকভাবে সূর্য এবং সেই মহাজাগতিক মেঘে এই দুয়ের মধ্যে কার ভর এবং আকর্ষনীশক্তি বেশী ছিল, এবং সেই সঙ্গে এটাও চিন্তার বিষয় ৫০,০০০ কিংবা ১৫০,০০০ জ্যোতিষীয় একক দূরে সূর্যের কী পরিমাণ দাপট অনুভূত হতে পারে, প্রবল না দুর্বল? বলা বাহুল্য প্রবল নিশ্চয়ই নয়। এই তর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সূর্যের দ্বারা মহাজাগতিক মেঘ থেকে ধূমকেতুর সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানীদের এই ধারণাটাই কেমন যেন গোলমেলে মনে হয়।

বরঞ্চ সূর্যের যেভাবে সৃষ্টি হয়েছে, গ্রহ-উপগ্রহগুলোর যেভাবে উদ্ভব হয়েছে, সেই সূত্র ধরে ধূমকেতুদের কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে সেই ব্যাপারটা তবু বোঝা যায়। যদি আধুনিক এ-তত্ত্বটা আমরা মেনে নিই মহাশূন্যে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকা গ্যাসীয় অণু এবং সূক্ষ্ম ধূলিকনা একটা দলা বেধে জমাট হয়ে সূর্যকে গড়ে তুলেছিল তখনও উপরোক্ত মালমশলা সব কিছু নিঃশেষিত হয়ে যায় নি, বেশ কিছু অবশিষ্টাংশ ছিল। এখনও যে একেবারে কিছু নেই তা নয়, অবশ্যই কিছু আছে। সূর্যের চারপাশ ঘিরে এই

সব মালমশলা তখন অভিকর্ষীয় বলের প্রভাবে আবর্তিত হচ্ছিল এবং এদের তখন প্রবণতাই ছিল ক্রমশই শীতল থেকে আরও শীতলতর হওয়া এবং জমাট বেঁধে গ্রহ-উপগ্রহে পরিণত হওয়া। অপেক্ষাকৃত কাছের এলাকাটায় গ্যাসীয় অণু এবং ধূলিকণা পরিমাণে বেশীই ছিল। সুতরাং সেখানে ঝড় আকারে গ্রহ-উপগ্রহগুলো তৈরী হয়েছিল। কিন্তু সূর্য থেকে সেই কোথায় ৫০,০০০ থেকে ১৫০,০০০ জ্যোতিষীয় একক দূরে Oort Cloud অঞ্চলে ধূমকেতু-সৃষ্টির মালমশলা অত্যন্ত বিরল অবস্থাতেই ছিল। ফলে সেখানে ছোট ছোট আকারে ধূমকেতুগুলো গড়ে উঠেছে বলে মনে করা চলতে পারে। তথাপি এখানে একটা ব্যাপারে আমাদের একটু খটকা থেকে যায়। প্রশ্ন উঠবে ধূমকেতুরা তো সংখ্যায় অগুণতি। এবং তারা আকারে যত ছোটই হক লক্ষ-লক্ষ কোটিতে-কোটিতে এত বিপুল সংখ্যায় ধূমকেতুসৃষ্টির উপাদান কি Oort Cloud অঞ্চলে মজুদ ছিল? তবু যদি তাই সত্যি হয় তাহলে গ্রহ সৃষ্টি এবং ধূমকেতুর উৎপত্তির মধ্যে পার্থক্যটা ধরা যায়। সূর্যের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী অঞ্চলে গ্রহগুলো বিশেষ একটা পরিবেশ এবং পরিস্থিতির সুযোগ পেয়েছে। তাদের উপর সূর্যের তাপ, আলো এবং বিকিরণ-শক্তির নানান কার্যকারী প্রভাব কাজ করছে, তাদের বায়ুমণ্ডল গড়ে উঠেছে। বিশেষ বিশেষ উপাদান নিয়ে তারা একটা বিশেষ ধরণেও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ধূমকেতুর ক্ষেত্রে তা হয় নি। কারণ, প্রধানত, সূর্য থেকে এদের দূরত্বের ব্যবধান অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। Oort Cloud অঞ্চলে সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে না, জায়গাটা এত চিরঅন্ধকারে নিমজ্জিত। সূর্যের তাপও সেখানে তার সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। তাপমাত্রা সেখানে পরম শূন্যতারও নিচে গিয়ে পৌঁছেছে, অর্থাৎ শূন্য ফারেনহাইটের নিচে ৪৯৫ ডিগ্রী। সূর্যের বিকিরণশক্তির প্রচণ্ড রবরবাও সেখানে অনুভূত হয় না। এখন কথা হল উপরোক্ত বক্তব্যগুলো গ্রথিত করে আমরা ভাবতে পারি যে Oort Cloud-এর মতন এই রকম বিচিত্র পরিবেশে এবং সেখানকার অদ্ভুত সব

কার্যকারণগুলোর জন্য সেই জায়গায় ধূমকেতুগুলো সৃষ্ট হয়ে আছে। আমাদের এই অনুমানকে ধূমকেতুগুলো সৃষ্টির একমাত্র কারণ হিসেবে আমরা মেনে নিতে পারতাম, কেন না এর মধ্যেও কিছু কিছু যুক্তি আছে, তথ্যও কিছু আছে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের অনেকেই এ-বিষয়ে আরও কিছু গবেষণা এবং বিশ্লেষণ চালিয়ে আশ্বস্ত হতে চাইছেন। কোন একটা দাবীকেই এখন তাঁরা শেষ কথা বলতে চাইছেন না।

ধূমকেতুর উৎপত্তি নিয়ে রুশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভে.সেখ্.স্‌ভিয়াতস্কি (Veskhsvyatski) কিংবা ডাচ জ্যোতিবিজ্ঞানী, ভোয়েরকম (Woerkem) যেসব কথা বলেছিলেন তার মধ্যে যথেষ্ট অভিনবত্ব আছে, কিন্তু এঁদের বক্তব্য আমাদের মেনে নিতে যথেষ্ট আপত্তির কারণ আছে। ভে.সেখ্.স্‌ভিয়াত.স্কির বক্তব্য ছিল মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এই সব গ্রহে কয়েকশো কোটি বছর আগে ক্রমাগতই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত লেগে থাকত। তখন ঝলকে ঝলকে লাভা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হত এবং অগ্ন্যুৎপাতজনিত সেই সব পদার্থ একেবারে দূর-দূরান্তের Oort Could অঞ্চলে গিয়ে জমা হত। তারপর অপরিসীম ঠাণ্ডা এবং অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে সেই সব পদার্থ জমে গিয়ে ধূমকেতুতে পরিণত হয়েছে। এ কথা ঠিক যে বৃহস্পতি কিংবা শনি ইত্যাদিতে কিছু কিছু আগ্নেয়গিরি থাকার সম্ভাবনাকে বিজ্ঞানীরা উড়িয়ে দিতে চাইছেন না। বিশেষ করে বৃহস্পতির উপগ্রহ আইওতে (10) জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু বৃহস্পতি, শনি এরা সকলেই হল বিশালকায় গ্রহ, এদের ভরও সেই অনুপাতে অত্যন্ত বেশী, এমন কি পৃথিবীর চেয়ে বৃহস্পতির চৌম্বকক্ষেত্রও অনেক বেশী শক্তিশালী। এক্ষেত্রে তাহলে আমাদের ভেবে দেখতে হবে বৃহস্পতি ইত্যাদি গ্রহে সেই সব আগ্নেয়গিরি সংখ্যায় কত ছিল। অসংখ্য কি? তা নিশ্চয়ই নয়। তাহলে Oort Cloud অঞ্চলে ধূমকেতুসৃষ্টির এত বিপুল মালমশলা কি থাকতে পারে? তারপর, দ্বিতীয়ত, বৃহস্পতি ইত্যাদি থেকে আগ্নেয়গিরির লাভাজাতীয় পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হওয়ার জোরই বা কতটা

ছিল। বৃহস্পতি-শনির প্রবল অভিকর্ষের জোর উপেক্ষা করে সেই সব পদার্থ কি অকল্পনীয় দূরে Oort Could অঞ্চলে ছিটকে গিয়ে জমা হতে পারে? খুব বড় প্রশ্ন এটা। কিন্তু ভ্‌সেখ্‌স্‌ভিয়াত্‌স্কি এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরুত্তর! অথচ আমাদের উদাহরণটা নিলে বোঝা যায় পৃথিবীর যখন সৃষ্টি হল তখন তার পর আরও বহুকাল পর্যন্ত পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিরাট একটা পরিবর্তন চলছিল। তখন এই পরিবর্তনের পিছনে ইউরেনিয়াম জাতীয় তেজস্ক্রিয় মৌলের মুখ্য ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়েছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে স্পঞ্জের মতন সছিদ্র পাথরে নানান গ্যাস তখন আটকে পড়ে ছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ তাপ যখনই এবং যে-হারে বেড়েছিল তখনই কোথাও না কোথাও সেই পরিমাণে পাথর গলে গিয়েছিল এবং গ্যাসগুলোও মুক্তি পেয়েছিল। এইভাবেই তীব্র অগ্ন্যুৎপাতের ফলে লাভা উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের জোর এত প্রবল যে গ্যাস অথবা অন্যান্য বস্তুকণা দূর শূন্যে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। পৃথিবীর চারপাশে আমাদের আকাশেই জমা হয়েছিল এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে বিশেষভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। কিন্তু বৃহস্পতি-শনি ইত্যাদি গ্রহের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতজনিত মালমশলা সেই সব গ্রহের চারদিকের বায়ুমণ্ডলেও তো জমা হতে পারত, কিন্তু তা না হয়ে সেই কোথায় Oort Cloud অঞ্চলেই বা কিভাবে ছিটকে গিয়ে পড়ল? অতএব ভ্‌সেখ্‌স্‌ভিয়াত্‌স্কিকে সমর্থন করতে গেলে এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের পেতে হবে। কিন্তু ভসেখ্‌স্‌ভিয়াতস্কির তরফ থেকে এসব প্রশ্নের কোন উত্তরই আমরা পাচ্ছি না।

যুক্তিগ্রাহ্য উত্তরের অভাবে ডাচ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভোয়েরকমকেও সমর্থন করায় যথেষ্ট বাধা আছে। ভোয়েরকম অবশ্য ভ্‌সেখ্‌স্‌ভিয়াতস্কির সুরে কথা বলেন নি, তিনি অন্যভাবে asteroid-দের কথা ভেবে ধূমকেতু সৃষ্টির ব্যাখ্যা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তিনি নিশ্চিতই ধরে নিয়েছিলেন মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝে একদা

অন্য আর একটা গ্রহ কোন এক বিরাট বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায় এবং সেই ধ্বংসাবশেষের ভারী অংশগুলো হল asteroid। তারাই ঝাঁকে ঝাঁকে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝে ঘোরাফেরা করছে, আর হালকা অংশগুলো অনেক দূরে সেই Oort Colud-এর কাছে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং তারাই হল ধূমকেতু। কিন্তু বাস্তবে সত্যিই কি এটা সম্ভবপর? এ্যাসটেরয়েড এবং ধূমকেতুর পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন সূর্যের খুব কাছে থাকার ফলে সূর্যের প্রচণ্ড বিকিরণশক্তির প্রভাবে এ্যাসটেরডেদের চারপাশে কোন গ্যাসীয় আবরণ গড়ে উঠতে পারে নি, কিন্তু Oort Cloud অঞ্চলে সূর্যের বিশেষ দাপট নেই বলে ধূমকেতুদের চারধারে একটা অদ্ভুত গ্যাসীয় আবরণ গড়ে উঠেছে। এ-কথাটা মানা চলতে পারে, কিন্তু ভোয়েরকমের উপরোক্ত প্রথম ধারণাটা সম্বন্ধে আমরা কী বলব? তাছাড়া গ্রহ ভেঙ্গে এ্যাসটেরয়েডদের সৃষ্টি হয়েছে এ-তত্ত্বটাও আজ বিতর্কসাপেক্ষ। এ্যাসটেরয়েডের উৎপত্তি নিয়ে বিজ্ঞানীরা নানান কথা বর্তমানে ভেবে চলেছেন।

ধূমকেতুর আদি-উৎপত্তি নিয়ে এতক্ষণ সংক্ষেপে আমরা যা আলোচনা করলাম এর পরিপ্রেক্ষিতে এই উপসংহারে আমরা আসতে পারি যে কোন একটা নির্দিষ্ট তত্ত্ব এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে আসছে না। ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য তোলা রয়েছে। দেখা যাক তখন ধূমকেতুর উৎপত্তিগত সব জল্পনা-কল্পনার শেষ হয় কি না। এখন আমরা অন্য আর একটা কথায় আসছি। সেটা হল যদি আমরা ভেবে নিই Oort Cloud অঞ্চলে ধূমকেতুগুলো জমা হয়ে আছে তাহলে আমাদের জিজ্ঞাসা হবে সেখান থেকে ধূমকেতুগুলো গ্রহ অথবা সূর্যের কাছে আসে কীভাবে? কে ওদের অরটের মেঘরাজ্য থেকে উৎখাত করে? একটু আলোচনা করা যাক।

এ-বিষয়ে এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের তিন ধরণের ধারণার কথা আমরা শুনছি।

প্রথম কথা, সৌরমণ্ডলের একেবারে প্রত্যন্ত প্রদেশে যেখানে

আমরা Oort Cloud-এর কথা ভেবে নিয়েছি সেই বলয়ের ওপারে আরও কত নক্ষত্র আছে এবং বলা বাহুল্য তারা আমাদেরই নক্ষত্রজগৎ বা galaxy-র অন্তর্গত। মহাকাশে নক্ষত্র মাত্রেই যে গতিশীল, তাদেরও যে আবর্তন আছে, এ-বিষয়ে নতুন করেও কোন কিছু বলার নেই। এখন, কিছু বিজ্ঞানীর মতে, Oort Cloud-এর ওপারের জায়গা দিয়ে ভ্রাম্যমাণ কোন-না-কোন নক্ষত্র Oort Cloud-এর কাছে মাঝে মাঝে চলে আসে। তখনই তারা Oort Cloud-এর ধূমকেতুদের উপর নিজেদের অভিকর্ষের জোর ফলাতে শুরু করে। তখন, এই অবস্থায়, সেই সব নক্ষত্রের অভিকর্ষের ধাক্কায় কিছু কিছু নক্ষত্র তাদের এই আস্তানা থেকে অনায়াসেই বাস্তুচ্যুত হয়। ধূমকেতুগুলো Oort Cloud থেকে মুক্তি পেয়ে যে-কোনও দিক থেকে এবং যে-কোনও মাপের কক্ষপথ সৃষ্টি করে সৌরমণ্ডলের খাসমহলে ঢুকে পড়ে। এদিকে ধূমকেতুগুলো যতই সূর্যমুখো হয়ে এগিয়ে চলেছে সূর্যও তত ওদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে শুরু করে। এইভাবেই ধূমকেতু সূর্যকে বেড় দিয়ে ঘুরে যায়। এই যে মতবাদ এটা সকলের সমর্থন পাবে কি পাবে না সেটা অন্য কথা, কিন্তু এর মধ্যে যে যথেষ্ট যুক্তি আছে এটা আমাদের মানতেই হবে।

বিজ্ঞানীদের উপরোক্ত ধারণা ছাড়া তাঁরা এই প্রসঙ্গে আরও দু-ধরণের যে-ধারণা সৃষ্টি করতে চাইছেন। তার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি, যতটা না যুক্তি আছে তার চেয়েও বেশী সেখানে অনুমান এবং সম্ভাব্যতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ধূমকেতুরা তাদের উৎসস্থান থেকে মুক্তি পেয়ে কীভাবে সৌরমণ্ডলে প্রবেশ করে সেই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কিছু বিজ্ঞানী সূর্যকে একটা যুগ্ম-তারা বা Binary Star মনে করে নিয়ে এই বিষয়ে তাঁদের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। এই দলে যাঁরা আছেন তাঁরা মনে করে নিতে চাইছেন আমাদের নক্ষত্রজগতের বহু নক্ষত্রেরই যেমন একটি করে সঙ্গী-নক্ষত্র আছে এবং তারা যেমন পরস্পর বিশেষ একটা কেন্দ্রীভূত মাধ্যাকর্ষণের টানে আবদ্ধ হয়ে পরিক্রমা করছে, ঠিক তেমনি নক্ষত্র হিসেবে আমাদের

সূর্যও নাকি নিঃসঙ্গ নয়, তাকেও যুগ্ম তারা বলা চলে। সূর্যের সঙ্গী-নক্ষত্র আছে বিজ্ঞানীরা 'বলা চলে' এই কথাটা বলছেন, কিন্তু এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আজও পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষত কোন প্রমাণ দিতে পারেন নি। কেন না আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত শক্তিশালী দূরবীন আছে তার সাহায্যে শত চেষ্টা করেও সূর্যের প্রস্তাবিত এই সঙ্গী-নক্ষত্রকে চাক্ষুষ দেখা সম্ভবপর হয় নি। তথাপি বিজ্ঞানীরা নিরলস চেষ্টা করে চলেছেন। বিশেষ করে ক্যালিফোর্ণিয়ার বিজ্ঞানী মুলার (Muller) এবং অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী টম গেরেল্‌স্ (Tom Gehrels) উত্তর গোলার্দ্ধের আকাশ দূরবীনের মাধ্যমে চষে ফেলার কাজে নেমে পড়েছেন, যদি কোনওক্রমে সূর্যের তথাকথিত এই সঙ্গী-নক্ষত্রের সন্ধান করা যায়, আর দক্ষিণ গোলার্দ্ধের আকাশ পর্যবেক্ষণের ভার নিয়েছেন লরেন্স বার্কলে ল্যাবরেটরীর পদার্থবিদ জর্ডিন কারে (Jordin Kare)। সূর্যের এই সঙ্গী নক্ষত্রকে এখনও পর্যন্ত দেখা যাক বা না যাক বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে কিন্তু এই নক্ষত্র সম্বন্ধে আরও কিছু কথা ভেবে রেখেছেন। এঁরা বলতে চাইছেন সূর্যের এই সঙ্গী নক্ষত্র আকারে এতটুকুও বড় নয়, বরঞ্চ একে একটা শ্বেতবামন (White Dwarf) নক্ষত্রই বলা ভাল এবং খুবই অনুজ্জ্বল। এর ভর এবং ঔজ্জ্বল্যের কথায় বিজ্ঞানীরা ভাবছেন সূর্যের তুলনায় এর ভর এক-তৃতীয়াংশের বেশী নয় এবং ঔজ্জ্বল্য সূর্যের সহস্র ভাগের এক ভাগ। এর কক্ষপথও নাকি দীর্ঘায়িত বিশালাকৃতির। প্রতি তু-কোটি ষাট লক্ষ বছর অন্তর সূর্যের কাছে এসে হাজির হয়। নক্ষত্রটার অদ্ভুত একটা নামও দেওয়া হয়েছে। নেমেসিস (Nemesis), অর্থাৎ কি না মরণ-নক্ষত্র।

এখানে একটা কথা আমাদের মনে হবে সূর্যের সঙ্গী-নক্ষত্রকে আজও পর্যন্ত যখন চোখে দেখা সম্ভব হয় নি, তার সম্বন্ধে যখন কোন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে না, তখন সেই নিয়ে বিজ্ঞানীরা এত জল্পনা-কল্পনাই বা করতে শুরু করবেন কেন? অনুমানেরও তো একটা কারণ থাকে। কিন্তু কারণটা কী?

এর উত্তরে বিজ্ঞানীরা বলছেন সূর্যের সঙ্গী-নক্ষত্রের বিষয়টা বিতর্ক মূলক হলেও পৃথিবীতে জৈবিক অবলুপ্তির কারণ বিশ্লেষণ করে সূর্যের এই রকম একটা সঙ্গী-নক্ষত্রের অস্তিত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা চলে। আমরা জানি প্রাগৈতিহাসিক বিশালাকায় জীবেরা একদা যারা সদর্পে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে বেড়াত তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠী বা শ্রেণী সহসা একদিনে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। মহাকালের এক-একটা পর্যায় ধরে পৃথিবীতে জৈবিক অবলুপ্তি ঘটেছে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদ ওয়ালটার এ্যালভারেজ (Walter Alvarez) একটা হিসেব-নিকেশ করে বলেছেন পৃথিবীতে এই রকম একটা জৈবিক অবলুপ্তির ঘটনা আজ থেকে আনুমানিক তিন কোটি বছর আগে ঘটে গিয়েছে। এর পিছনে সূর্যের ওই সঙ্গী-নক্ষত্রের নাকি হাত ছিল। আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যুগ্মতারা হিসেবে সূর্যের কাছাকাছি অঞ্চলে আসতে সময় নেয় ২ কোটি ৬০ লক্ষের মতন বছর। তখন সূর্য থেকে তার আনুমানিক দূরত্ব থাকে ৩০০০ জ্যোতির্বীয় একক দূরত্ব। আগে প্রদত্ত রেখাচিত্রটা দেখলেই বুঝতে পারা যায় অরটের মেঘরাজ্যের ওপারে কোন এক জায়গা থেকে যাত্রা করে সূর্যের সেই সঙ্গী-নক্ষত্রকে Oort Cloud ভেদ করে সূর্যের কাছে চলে আসতে হচ্ছে। Oort Cloud-এর মধ্য দিয়ে পথ করে চলার সময় নক্ষত্রটার মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ধূমকেতুদের আস্তানায় তখন চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মাধ্যাকর্ষণের টানে কিছু ধূমকেতু তখন তাদের জায়গা থেকে বিচ্যুত হয়ে সূর্যের দিকে ধাবমান হয়। ফলে পৃথিবীর আকাশ ধূমকেতুতে ছেয়ে যায়, তখনই দীর্ঘ দিন ধরে পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় চলতে থাকে এবং এর ফলে জীবের অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

কিন্তু এখানেও আমাদের প্রশ্ন আছে। যাঁরাই সূর্যের সঙ্গী-নক্ষত্রের কথা বলছেন তাঁদের নিজেদেরই বক্তব্য হল এই নক্ষত্রের ভর অত্যন্ত কম, আকারেও এই নক্ষত্র অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার। এই ধরণের নক্ষত্রের কি তাহলে প্রবল আকর্ষণশক্তি থাকতে পারে,

সে কি তাহলে শুয়ে শুয়ে ধূমকেতুকে তাদের আস্তানা থেকে উৎখাত করতে পারে? আর দ্বিতীয় কথাটা হল যুগ্মতারাদের কক্ষপথ কি অস্বাভাবিক ধরণের দীর্ঘায়িত হয়? লুব্ধক (Sirius A) এবং তার সঙ্গী-নক্ষত্র (Sirius B), অরুন্ধতী-বশিষ্ঠ (AlcorMizar) ইত্যাদি যুগ্মতারারা কি পরস্পরের কাছ থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে বিরাট দূরত্বে রয়েছে? এবং সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না পেলে সূর্যের সঙ্গী-নক্ষত্রের অস্তিত্ব এবং তার দ্বারা অরটের অঞ্চল থেকে ধূমকেতুদের উচ্ছেদের প্রসঙ্গটা আমরা মেনে নিতে পারি না।

ঠিক এইভাবে, কিছু বিজ্ঞানী যাই বলুন, কোন গ্রহের দ্বারাও Oort Cloud থেকে ধূমকেতুর উৎখাতের ব্যাপারটা ভাবা যায় না। লুইসিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিঃর্পদার্থবিদ ড্যানিয়েল হোয়াইটমায়ার (Daniel Whitmire) দাবী করেছেন যে প্লুটোর পরেও একটা গ্রহ আছে, তার নামও দেওয়া হয়েছে, Planet X। হোয়াইটমায়ারকে মদত দিচ্ছেন আরও কিছু বিজ্ঞানী। এঁদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী রবার্ট হ্যারিংটান (Robert Harrington) রয়েছেন। এঁদের বক্তব্য হল Planet X নামে এই গ্রহ নিতান্ত ছোটখাট মামুলি ধরণের কোন গ্রহ নয়। বরঞ্চ বলা উচিত গ্রহটা আকারে বড়, তার বিপুল ভর, পৃথিবী অপেক্ষা অন্তত তিন থেকে পাঁচ গুণ বেশী। গ্রহটার একটা বৈশিষ্ট হল এর অধিকাংশ মালমশলা গ্যাসীয় উপাদানে তৈরী, আর এর কক্ষপথটাও তেমনি অদ্ভুত। অন্য গ্রহদের কক্ষপথ যে-ধরণের বৃত্তাভাস বলে জানা গিয়েছে, Planet-X এর কক্ষপথকে সেখানে বিশাল আকারে প্রলম্বিত অবস্থায় আছে বলে দাবি করা হচ্ছে। অন্য গ্রহদের সঙ্গে এর আরও একটা বিশেষ রকমের পার্থক্য হল অন্য গ্রহেরা সূর্যের নিরক্ষরেখার সঙ্গে মোটামুটি যে-ধরণের সমতল তৈরী করে রেখেছে, বিজ্ঞানীরা বলেছেন Planet X সেখানে সূর্যতলের সঙ্গে অন্তত কম করে ৩০° কোণ তৈরী করে হেলে আছে।

এই ধরণের বিরাট দীর্ঘায়িত কক্ষপথ ধরে ঘুরতে হয় বলে এর একটা প্রান্ত সময় সময় অরটের বলয় ছুঁয়ে যায়। এই কাণ্ডটা মোটামুটি আড়াই কোটি বছর অন্তর ঘটতে থাকে। আর পৃথিবীতে জীবের অবলুপ্তির ব্যাপারটা? আমরা আগেই উল্লেখ করেছি আজ থেকে প্রায় আড়াই কোটি বছর আগে পৃথিবীতে এক প্রস্থ জৈবিক অবলুপ্তি ঘটে গিয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। Planet X মতবাদের যাঁরা সমর্থক তাঁদের বক্তব্য এই দশম গ্রহটা যখনই অরটের মেঘরাজ্যের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে চলে যায় তখনই সে কিছু ধূমকেতু ছিনিয়ে নেয় এবং তার ফলে পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে জৈবিক অবলুপ্তি ঘনিয়ে আসে।

এখন, বিশ্লেষণী মনোভাব নিয়ে বিচার করলে বিজ্ঞানীদের এ-দাবীও নড়বড়ে বলে মনে হবে। যেমন, প্রথম কথা, দশম গ্রহ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ধরেই দাবী, বাদ-প্রতিবাদ করে আসছেন। গত শতকে একজন ফরাসী জ্যোতির্বিদ দাবী করেছিলেন সূর্য আর বুধের মাঝে তিনি ছোটখাট একটা গ্রহ দূরবীনের মধ্য দিয়ে দেখে ফেলেছেন। এমন কি তিনি ওটার নামকরণও করলেন, ভালকান (Vulcan)। কিন্তু এ-দাবী তাঁর ধোপে টেঁকে নি, কেন না তাঁর প্রস্তাবিত এই গ্রহ অন্য কারও চোখে পড়ে নি। আবার, বর্তমান শতকে আমেরিকার পালোমার মানমন্দিরের একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী চার্ল্‌স্ কোওয়াল দূরবীনের মাধ্যমে গৃহীত আলোক-চিত্র পেশ করে দাবী তুলেছিলেন শনি এবং ইউরেনাসের মধ্যে একটা গ্রহের অস্তিত্ব তিনি জানতে পেরেছেন। নামও দেওয়া হল, Object Kowal। কিন্তু ৩০০ মাইলের বেশী এর ব্যাস নয়, সম্ভবত একটা asteroid বা গ্রহাণু। তারপর, তৃতীয় আর একটা দাবী উঠেছে যে প্লুটোর পরেও একটা গ্রহ আছে যদিও চাক্ষুষ দেখা সম্ভব হয় নি। এই গ্রহেরই নাম হল Planet X। প্লুটো তার কক্ষপথ থেকে মাঝে মাঝে একটু-আধটু সরে-নড়ে যায়। এই যে বিচ্যুতি, কেন হয়? তবে কি প্লুটোর পরে আর কোন গ্রহ আছে যে

নাকি প্লুটোকে সামান্য আকর্ষণ করছে ? এটাই হল প্রশ্ন। নেপচুনের আবিষ্কার অনেকটা এইভাবেই হয়েছিল। দেখা যেত ইউরেনাস তার পথ থেকে সামান্য নড়ে-চড়ে বসছে। এইভাবেই অনুসন্ধান শুরু হয় এবং নেপচুন আবিষ্কৃত হয়। জানা গেল নেপচুনের জন্যই অমনটা হচ্ছিল।

এইভাবে দশম গ্রহ **Planet X** সম্বন্ধে আজও যেমন কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নি, এই গ্রহের আয়তন, কক্ষপথ, ভর ইত্যাদি নিয়েও আগে থেকে আমাদের কোন কিছু ভেবে রাখা উচিত হচ্ছে কি না এটাও বিতর্কের বিষয়। অন্য গ্রহেরা যেভাবে সূর্যের নিরক্ষরেখার সঙ্গে প্রায়-সমতলীয় অবস্থায় গড়ে উঠেছে এবং তারা যেভাবে সূর্যের চারদিকে প্রায়-বৃত্তাভাস পথে ঘোরে এর থেকে বোঝা যায় একটা নিয়ম মেনে তাদের সৃষ্টির পর্ব এগিয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান বস্তুসম্ভার সূর্যতলের সঙ্গে প্রায়-সমতল বজায় রেখে জমাট বেঁধে গ্রহ হিসেবে বৃত্তাভাস পথে সূর্য-পরিক্রমা করছে এই সত্যটাই প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু **Planet X**-এর যাঁরা সমর্থক তাঁরা নিজেরাই বলছেন এই গ্রহের কক্ষপথ বৃত্তাভাস নয়, কিন্তু অস্বাভাবিক রকমের বড় দীর্ঘায়িত এই পথ। কিন্তু কেন, এমন পথ এর হল কেন ? কারণটা কী ? তারপর এই গ্রহ সূর্যতলের সঙ্গে ৩০° কোণ তৈরী করে হেলেই বা আছে কেন ? এটাই বা কী ব্যাপার ? তাছাড়া ইউরেনাস-প্লুটোর পর গ্রহেরা যখন ছোট হয়ে আসছে তখন **Planet X** গ্রহই বা আকারে আয়তনে বড় হল কেন ? শুধু তাই নয়, যদি আমরা ধরেই নিই বাস্তবে এই গ্রহের অস্তিত্ব আছে তাহলে আমাদের প্রশ্ন জাগবে প্লুটোর পর সেই কোথায় কত দূরে ধূমকেতুর আদি আস্তানা, অথচ সেই **Oort Cloud**-এর মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে এই গ্রহ পথ করে নিয়ে চলে যায়, কিন্তু সত্যিই কি প্লুটোর পর এক লাফে অস্বাভাবিক ব্যবধানের দূরত্বে গ্রহদের এমনি সঞ্চারপথ হতে পারে ? এই সব সমস্যাগত প্রশ্নের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত **planet X**-এর

প্রসঙ্গটা এখনই আমরা সংশয়মুক্ত অবস্থায় মেনে নিতে পারছি না।

পাদটীকা

১ অরটের কোন কৃতিত্বকেই আমরা ন্যূন করে দেখছি না। কিন্তু অরটের মতবাদ এক কথায় বিজ্ঞানী ওপিকের (Opik) মতবাদের পরিপূরক।

২ Nemesis হলেন গ্রীক-পুরাণ বর্ণিত এক দেবীর নাম। তিনি উদ্ধত, অহঙ্কারীদের শাস্তি দেন। মনে হচ্ছে সূর্যের প্রস্তাবিত সঙ্গী-নক্ষত্রের নাম Nemesis রেখে একটা রূপক অর্থ বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে।

১৫

ধূমকেতুর মাথার অংশ (কেন্দ্রীয় ভাগ বা নিউক্লিয়াস)

ধূমকেতুর head অর্থাৎ মাথার অংশটা Oort cloud থেকে উৎপাটিত হয়ে গ্রহমণ্ডলে যখন প্রবেশ করে তখন সত্যি কথা বলতে কি তার না থাকে কোন শ্রী, না থাকে কোন কার্যকরী ক্ষমতা! সূর্যের আকর্ষণে সে তখন সূর্য-সন্নিধানে কেবলই ছুটে চলেছে। শুধুমাত্র তখন তার এই গতি-টুকুই লাভ হয়েছে, আর কিছু নয়। অথচ ধূমকেতুর এই মৌল দেহভাগ, যা নিয়ে সে এতকাল তার সৃষ্টিক্ষেত্র অর্থাৎ Oort cloud অঞ্চলে বন্দী হয়ে ছিল, এটাই তার প্রাণ, তার হৃৎপিণ্ড, তার জীবনীশক্তির উৎস।
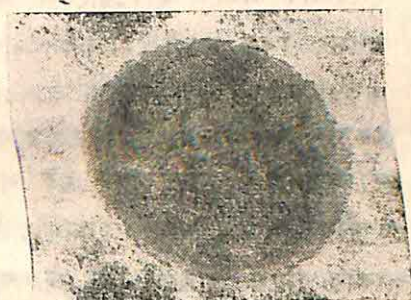
Sketch

ধূমকেতুর মাথার এই অংশের যে-ভাগটাকে আমরা বলেছি তার কেন্দ্রীয় অংশ বা nucleus তার কথাটাই আমরা বলব, আর যে-অংশটাকে আমরা বলেছি coma বা গ্যাসীয় আবরণ, যেটা আসলে ধূমকেতুর পুচ্ছদেশ গড়ে তোলে তার কথা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিবৃত করব।

হার্ভার্ডের অধ্যাপক ফ্রেড হুইপ্‌ল্ (F.L. Whipple) ধূমকেতুর কাঠামোগত প্রকৃতি এবং তার উপাদানগত বিন্যাস নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে বসে ১৯৫০ সালে চমৎকার একটা রসিকতা করে ধূমকেতুকে আখ্যা দিয়েছিলেন যে ধূমকেতু হল নোংরা বরফের গোলা বা dirty snow-ball। কথাটার আসলে নিগূঢ় একটা তাৎপর্য আছে।

সাধারণ সাদামাটা অর্থে আবর্জনা বলতে আমরা যা বুঝি ধূমকেতুর মধ্যে যেসব অবশ্য কিছু নেই। হুইপ্‌ল্ ধূমকেতুর যে-সংজ্ঞা তুলে ধরেছিলেন তার মর্মকথা হল ধূমকেতুর মধ্যে ধূলোর কণা যেমন রয়েছে, অন্য আরও কিছু বিশেষ বিশেষ মহাজাগতিক পদার্থ তার মধ্যে ধরা পড়ে আছে। সূর্য থেকে যত দূরে Oort cloud-এর আমরা কল্পনা করেছি সেই জায়গাটা ঠিক আন্তর্নাক্ষত্র পরিমণ্ডল নয়। তবে জায়গাটা যে মহাশূণ্যের গহন প্রদেশ এটা মানতে দ্বিধা নেই। সেই সব অঞ্চলে হাইড্রোজেন আছে, জলকণার অস্তিত্বও পাওয়া যাচ্ছে, কিছু ভারী মৌলিক পদার্থও রয়েছে, আবার অতি সূক্ষ্মাকারে একরকম কণিকা যাদের আমরা বলি কনড্রিউলস তাও আছে। এছাড়া এ্যমোনিয়া, মিথেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ডাইসায়ানোজেন তো আছেই। মহাবিশ্বের এই সব প্রাচীনতম উপাদান ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশের মধ্যে অবর্ননীয় ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে কঠিন বরফের আকার নিয়ে রয়েছে।[১] এই ব্যাপক অর্থে হুইপলের মন্তব্যকে অত্যুক্তি বলে মনে হবে না।

ধূমকেতু যে আসলে কী পদার্থ এ ভৌতজ্ঞান আগে আমাদের ছিল না। এবং শুধু হুইপলই নন, আরও কত বিজ্ঞানী, যেমন, হাগিন্স (Huggins), বেসেল (Bessel), ব্রেদেখিন (Bredekhin), ওপিক (Opik), হিরন্ (Hirn), রানিয়ার্ড (Ranyard), ভ্‌সেখ্‌স্‌ভিয়াতস্কি (Vsekhsvyatski), লেভিন (Levin), লিটলটন (Lytteton), এঁরা সকলেই কিছু না কিছুভাবে ধূমকেতুর বস্তুবিচার করেছিলেন। এঁরা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। এঁদের কাজ আরও কত বিজ্ঞানীকে উদ্দীপ্ত করেছে। ধূমকেতু আজ আর আমাদের কাছে রহস্যময় কোন বস্তু নয়। হতে পারে ধূমকেতু সম্বন্ধে আমরা যেমনটা চাইছি বিস্তৃত তথ্য থেকে আজও আমরা বঞ্চিত। তথাপি অস্বীকার করা চলে না ধূমকেতু নিয়ে আজ আমরা অনেক দূর এগোতেও পেরেছি।

তবে উপরোক্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে একমাত্র লিটলটন একটু

ব্যতিক্রমের কথা বলেছিলেন। তিনি ধূমকেতুর উপাদান সংক্রান্ত ঠিক কথাই বলেছিলেন, কিন্তু এর অঙ্গবিন্যাসের কথায় ভেবেছিলেন যে ধুমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ বা নিউক্লিয়াস এবং কোমা বা গ্যাসীয় আবরণ এই দুটো আলাদা আলাদা অংশ হয় না। এর পরিবর্তে তিনি ধুলো এবং গ্যাসের সমাহারে প্রস্তুত আগাগোড়া একই অখণ্ড রূপে ধূমকেতুর কল্পনা করেছিলেন। অবশ্য এমন কিছু ধূমকেতু আছে যাদের কেন্দ্রীয় অংশ বা নিউক্লিয়াসই হয় না। শুধুই গ্যাসীয় অংশ নিয়ে এরা গড়ে উঠেছে। কিন্তু এরা সংখ্যায় অঙ্গুলিমেয়, সমগ্র ধূমকেতুদের মধ্যে এরা শতকরা ৪/৫ ভাগও হবে কিনা সন্দেহ। আর এরা তত ছোট এবং নিষ্প্রভ। সাধারণ হিসেবে এরা পড়ে না, এদের আমরা ব্যতিক্রমের খাতাতেই জমা রাখতে পারি।

যাই হোক, কেন্দ্রীয় অংশ নিউক্লিয়াস সংক্রান্ত যে-কথা আমরা বলছিলাম, ধূমকেতুর মাথার অংশ বা head-এর গ্যাসীয় আবরণভাগের আয়তন প্রকাণ্ড হতে পারে, কয়েক লক্ষ থেকে কোটি মাইল পুরু হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু অবাক হয়ে যেতে হয় এর অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াসটা আয়তনে এমন কিছু বড় হয় না। মাত্র কয়েকশো মিটার থেকে শুরু করে সাধারণত ১৫/১৬ কিলোমিটারের মধ্যেই এর আকার সীমাবদ্ধ থাকে। অবশ্য ব্যতিক্রমের কথা স্বতন্ত্র। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অংশের ব্যাস বড় জোর ১০০ কিলোমিটার হতে পারে। নিউক্লিয়াসের আকার যে বড় হয় নি এর সহজ কারণ হিসাবে বলা যায় যে মাথার অংশটা যেখানে বস্তুর ঘনত্ব এত কম যে কোন কিছুর বড় আকারে পরিণতি লাভ করা মুশকিল। একটা নাতিবৃহৎ নিউক্লিয়াসের ভর যত বেশীই হক 10^{11} থেকে 10^{16} kg-র মধ্যেই তা ঘোরাফেরা করবে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। এই ভর আবার সমপরিমাণ কঠিন বরফ এবং ধূলিকণার মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। হিসেব করলে তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর ভরের লক্ষ ভাগেরও এক ভাগের বেশী এই ভর হবে না। আর কেন্দ্রীয় অংশের ঘনত্বের

কথায় যদি আসা যায় তাহলে সাধারণভাবে এর মাত্রা দাঁড়াবে প্রায় $2g/cm^3$ ।

কেন্দ্রীয় অংশ সম্বন্ধে এগুলো হল আমাদের অত্যন্ত প্রাথমিক তথ্য। এই তথ্যগুলোকে ভিত্তি করে ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ সম্বন্ধে এখন আরও কিছু প্রশ্ন আলোচনায় মন দেওয়া যাক।

যেমন, প্রথম প্রশ্ন, ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস একটাই অখণ্ড কঠিন বরফের চ্যাঙ্গাড় দিয়ে তৈরী হয়ে আছে, না খণ্ড খণ্ড কিছু অংশ আলতোভাবে পাশাপাশি জোড়া লেগে রয়েছে ? এবং পিণ্ডাকারে কঠিন বরফের এই অংশটা ছিদ্রযুক্ত, না তাতে কোনই ফাঁকফোকর নেই।

আমরা যতটুকু জেনেছি এ-বিষয়ে আমরা এইটুকু বলতে পারি যে ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশের মধ্যে মসৃন গোলাকার অতি সূক্ষ্ম
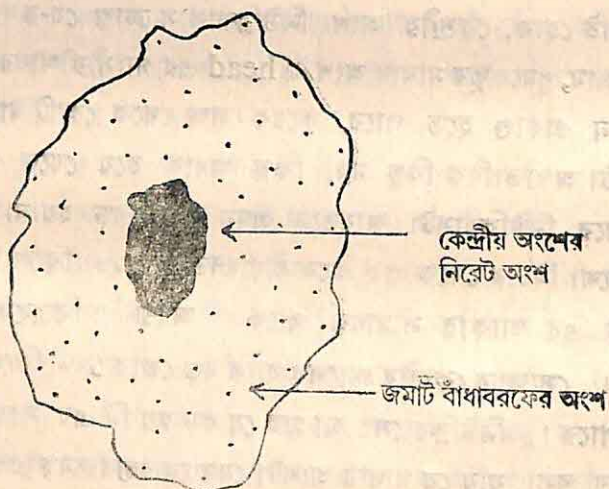
ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ বা নিউক্লিয়াস

বস্তুকণা থেকে শুরু করে এবড়ো-খেবড়ো নানান বড় বড় আকারে পাথরের মতন চাঁইও ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে রয়েছে। এই অবস্থায় নিউক্লিয়াসের কোন অংশই শিথিল আলতোভাবে থাকতে পারে না। এটাকে একটা নিরেট অখণ্ড অংশই মনে করতে হবে।

এখন আলোচনা করা যাক ধূমকেতুর এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে

কোন রকম ফাঁকফোকর আছে কি না। প্রথমে এই কেন্দ্রীয় অংশটাকে দু-ভাগে ভাগ করে নেওয়া যাক। এর একেবারে ঠিক কেন্দ্রের কাছাকাছি জায়গাটায় নানান বস্তুকণা-ধাতু ইত্যাদি অত্যন্ত ঘনীভূত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু এটা খুব ছোট পরিসর। এর চারপাশে মোটামুটি একটা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যাবতীয় পদার্থ এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। এই যে নিউক্লিয়াস এটা এমনিতেই নির্জীব, নিষ্ক্রিয়। কিন্তু সূর্যের কাছে এলেই এই অংশটা যেন জীয়নকাঠির ছোঁয়া লেগে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সামগ্রিকভাবে ধূমকেতুর মাথার অংশটা (অর্থাৎ head) যখন সূর্য থেকে বৃহস্পতি এবং শনির মধ্যবর্তী দূরত্বে (অর্থাৎ ৫/৬ জ্যোতিষীও একক দূরত্ব=১ জ্যোতিষীয় একক : সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব : ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল) এসে হাজির হয় তখনই গ্যাসীয় অংশ যেমন উত্তেজিত, চঞ্চল হয়ে ওঠে, কেন্দ্রীয় অশও তেমনি সূর্যের তাপ এবং বিকিরণ থেকে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করে। এই অবস্থায় নিউক্লিয়াসের উপরিভাগটা উত্তপ্ত হতে থাকে। কিন্তু পরিপূর্ণ সক্রিয় বলতে যা বোঝায় তখনও তার সেই অবস্থাটা হয় না। বৃহস্পতি এবং মঙ্গলের দূরত্বে এলেই সক্রিয়ভাবটা জেগে উঠতে থাকে। তখন কেন্দ্রীয় অংশের অভ্যন্তরে বরফের রূপে জলকণা, নানান পদার্থ, গ্যাস ইত্যাদি এতদিন যারা এখানে বন্দী হয়ে ছিল তারা তখন বাইরে নির্গমনের সুযোগ খুঁজতে থাকে। কিন্তু নিউক্লিয়াসের উপরিতল অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়িই উত্তপ্ত হয়। সেই তুলনায় এর গভীর তলদেশ অর্থাৎ কেন্দ্রের কাছে ছোট্ট পরিসরযুক্ত জায়গাটা সূর্যের তাপে অত তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয় না। কারণ জায়গাটা প্রস্তরজাতীয় বেশী নিরেট। এর থেকে বোঝা যায় কেন্দ্রীয় এই পরিসরকে বাদ দিলে নিউক্লিয়াসের আর সমস্ত অংশে কিছু না কিছু ফাঁকফোকর আছেই। তাই বলে নিউক্লিয়াসকে ঝামা পাথর জাতীয় বা স্পঞ্জের মতনও কোন কিছু মনে করা চলে না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে নিউক্লিয়াস অর্থাৎ কেন্দ্রীয় অংশটা ঘুরপাক খাচ্ছে, না এই অংশ অন্তত অচল অবস্থায় রয়েছে ?

বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই নিয়েও প্রচুর সংশয়, দ্বন্দ্ব, বাদপ্রতিবাদের অন্ত নেই। কারও কারও মতে ধূমকেতুর গ্যাসীয় অংশ বা কোমা আবর্তিত হয়, কিন্তু কেন্দ্রীয় অংশ বা নিউক্লিয়াস ঘোরে না। আসলে ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ একটা একটা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে রেখেছে। এই অংশ সদর্থে কেমন দেখতে এ-দাবী আজও আমরা করতে পারি নি। কেবল ধূমকেতুর গতিপ্রকৃতি, তার কাজের পদ্ধতি, তার কাঠামোগত বিন্যাস ইত্যাদি পর্যালোচনা করে অনুমান করা হচ্ছে যে কিছু ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ আবর্তিত হয় না। কিন্তু এ-কথা ব্যাপক-ভাবে সকল ধূমকেতুর ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হতে পারে না। অন্যান্য বহু ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস ঘোরে, তবে এই আবর্তনটা এক রকম নয়, বড় অদ্ভুত। কোন কোন নিউক্লিয়াস পশ্চিম থেকে পূবে ঘোরে, অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার উলটো দিকে। আবার কেউ বা ঘোরে পূব থেকে পশ্চিমে এখানে একটা কথা আছে। পুরনো কথা। কিন্তু আমাদের বোঝার স্বার্থে এর আমরা একটু পুনরাবৃত্তি করব। ধূমকেতুর কক্ষপথ নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করছিলাম তখন আমরা জেনেছি গ্রহদের আকর্ষণের টানে বা অভিকর্ষের ধাক্কায় ধূমকেতুরা সূর্যের অনুসূর স্থানে নির্দ্ধারিত সময়ের একটু আগেও এসে পড়তে পারে কিংবা সামান্য কিছু দেরীতেও আসতে পারে একে আমরা বলেছি অভিকর্ষীয় শক্তি বা gravitational force। কিন্তু গ্রহদের এই অভিকর্ষীয় শক্তি ছাড়া ধূমকেতুর এমন একটা আবর্তনবেগ আছে যার ফলে তার নিজেরই সামান্য কিছু শক্তি গড়ে ওঠে। একে আমরা বলব non-gravitational force। ধূমকেতুর এই নিজস্ব গতিশক্তির জন্য সূর্যের নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারে সে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে বা কিছু পরেও আসতে

পারে। কিন্তু এই non-gravitational force কীভাবে গড়ে উঠে সেই আলোচনায় একটু আসা যাক।

নিউক্লিয়াসের উপরিতলের ফাঁকফোকরগুলো অত্যন্ত সরু, সূক্ষ্ম ছিদ্র। সূর্যের খুব কাছাকাছি যখন ধূমকেতুর মাথার অংশটা এসে হাজির হয় তখন নিউক্লিয়াসটা যদি অত্যন্ত তেতে ওঠে তাহলে সামান্য ফাঁকফোকরগুলোর মধ্য দিয়ে ধুলোর কণা এবং গ্যাস তীব্র বেগে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইবে। এখানেই নিউটনের গতিবেগ সংক্রান্ত তৃতীয় সূত্রের কথা স্মরণে আসবে। এর ব্যাখ্যা হল, মনে করা যাক ধূলিকণা বা গ্যাস অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তখন তা প্রসারিত হতে চাইবে, কিন্তু তাকে যদি সরু ছুঁচলো কোন নির্গমনের পথ দিয়ে বের হতে হয় তখন এই পরিস্থিতিতে তা ছড়িয়ে পড়তে পারবে না, এদিকে প্রচণ্ড তার গতিবেগ জন্মে গিয়েছে, সুতরাং পশ্চাদ্দিকেও একটা শক্তি সঞ্চারিত হবে। এখন এই যে প্রতিক্রিয়ার অর্থাৎ জেট শক্তির সৃষ্টি হল, এই জেটশক্তি পরিমাণে কতটা হবে সেটা নির্ভর করবে কী পরিমাণ পদার্থের বস্তুমান উত্তপ্ত হচ্ছে, তার গতিবেগ কেমন হচ্ছে, তার উপর।

উদাহরণস্বরূপ, একটা বায়ুপূর্ণ বেলুন নেওয়া যাক। ফোলানো এই বেলুনটার ভিতর বায়ুর চাপ বেলুনের রবারের গায়ে সর্বত্রই সকল বিন্দুতে সমানভাবে পড়বে। ফলে বেলুনটা নড়াচড়া করবে না, স্থির থাকবে।

হাওয়াভর্তি বেলুন ঘুরবে না
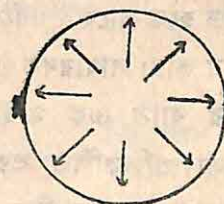
কিন্তু বেলুনটার মুখ যে-মুহূর্তে খুলে দেওয়া হবে তৎক্ষণাৎ ভিতরের হাওয়া তীব্র বেগে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইবে। এদিকে বেলুনের ভিতরের বাতাসও বেলুনের গায়ে বিপরীত অবস্থার কিছু চাপ সৃষ্টি করবে। ফলে দেখা যাবে বেলুনটা ঘুরপাক খেয়ে গেল। এই হল জেট শক্তির কাজ।

এখন, নিচের ছবিটা লক্ষ্য করা যাক এবং মনে করা যাক কোন

একটা ধূমকেতু সূর্য-পরিক্রমা করছে. কিন্তু তার গতিটা হল ঘড়ির কাঁটার উলটো দিকে, অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূবে। আর নিউক্লিয়াসের গতিটা হল ধূমকেতু যে-দিক দিয়ে ঘুরছে সেই দিকে নয়, কিন্তু তার বিপরীত দিকে, অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে সেইভাবে, অর্থাৎ পূব থেকে পশ্চিমে। এই অবস্থায় জেট শক্তি ধূমকেতুর গতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ফলটা দাঁড়াবে ধূমকেতু তখন সূর্যের অনুসূর স্থানে অপেক্ষাকৃত আগে এসে পৌঁছবে।
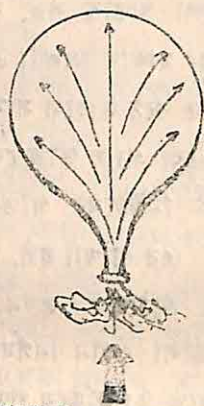
মুখখোলা বেলুন ঘুরে যাবে

নিচের এই ছবিটাও লক্ষ্য করা যাক। এখানে আমরা দেখছি ধূমকেতু যে-মুখো ঘুরছে তার নিউক্লিয়াসও সেই মুখো আবর্তিত হচ্ছে। এই অবস্থায় জেট শক্তি ধূমকেতুর গতিকে ত্বরান্বিত করে তুলবে। এর ফলে ধূমকেতুর কক্ষপথের সামান্য বিস্তৃতি ঘটবে এবং ধূমকেতুর পক্ষে সূর্যের অনুসূর স্থানে আসতে সামান্য বিলম্ব হবে।

যখনই কোন ধূমকেতু সূর্যের খুবই নিকটবর্তী হয় তখনই নিউ-ক্লিয়াস থেকে ধূলিকণা অবিরাম গ্যাসীয় পরমাণুর স্রোতের সঙ্গে নির্গত হতে থাকে। নিউক্লিয়াস থেকে যেসব ধূলোর কণা বেরিয়ে আসে তারা সাধারণত দু-শ্রেণীর হয়। এক হল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধূলিকণা, এদের ব্যাস এক মাইক্রোনের* কয়েক দশমাংশ মাত্র হয়। সূর্যের আলো প্রতিফলিত করার এদের ক্ষমতা বড় কম। কিন্তু এদের চেয়ে যারা সামান্য কিছু বড় আকারের ধূলিকণা হয় তারা খুব সহজেই সূর্যের আলো প্রতিফলিত করতে পারে। এদের ব্যাস সাধারণত এক মাইক্রোন থেকে কয়েক দশকের কিছু বেশী মাইক্রোন হতে পারে। ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ থেকে এই সব ধূলিকণা কী ধরণের গতিবেগে নির্গত হবে সেটা নির্ভর করবে এদের আকার, ঘনত্ব এবং

* ১ মাইক্রোন = ১ মিলিমিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগ।

কেন্দ্রীয় অংশের ব্যাসের উপর। এখন মনে করা যাক কোন ধূলিকণার ব্যাস হল প্রায় ০·১ মাইক্রোন এবং তার ঘনত্ব হল এক
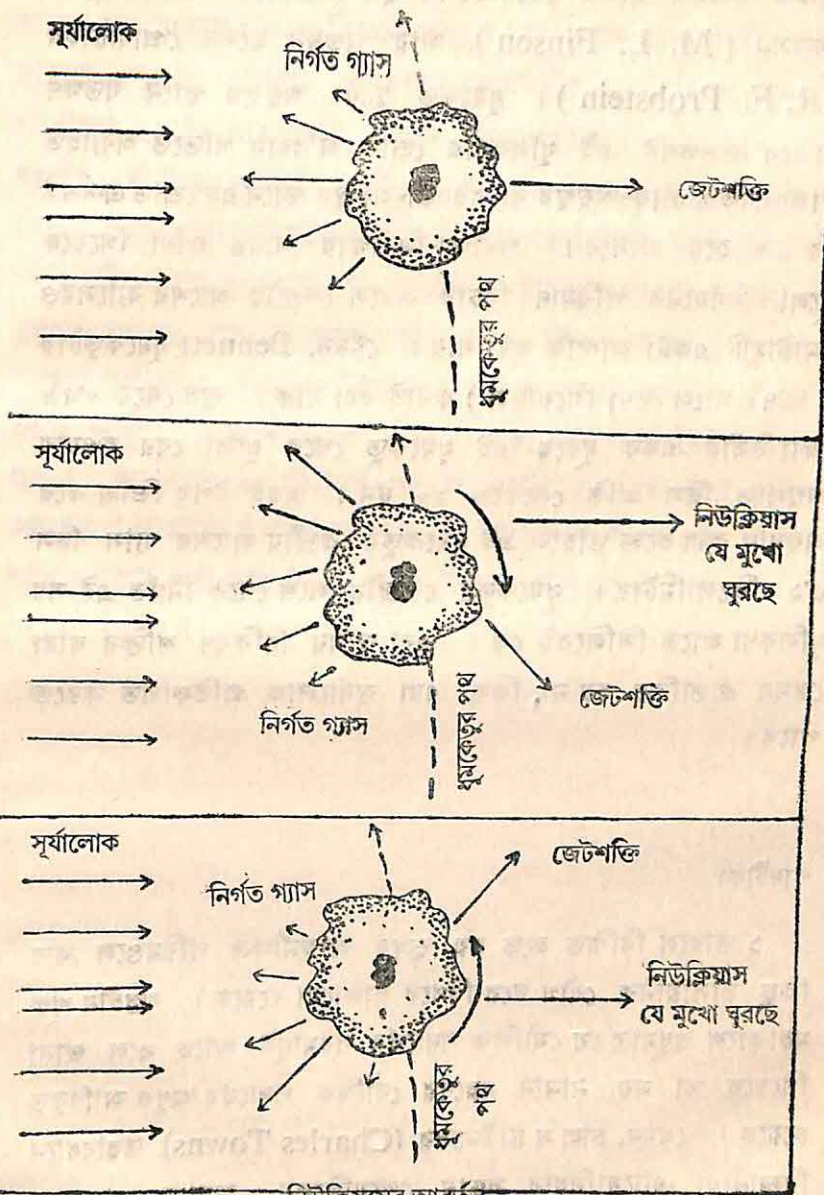
বর্গ (Cubic) সেন্টিমিটার প্রতি প্রায় ০·৪ গ্রাম। এবং আড়াআড়ি-ভাবে নিউক্লিয়াসের ব্যাস হল প্রায় ৬ কিলোমিটার। এই অবস্থায়

100 m/sec গতিবেগে ধূলিকণা নির্গত হতে থাকবে। এই বিষয়ে সুন্দর কাজের স্বাক্ষর রেখেছিলেন দুই বিজ্ঞানী। একজন হলেন ফিনসন (M. L. Finson), আর অন্যজন হলেন প্রোবস্টাইন (R. F. Probstein)। ধূমকেতু সূর্যের অনুসূর স্থানে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণই এই ধূলিকণার স্রোত অবিরাম গতিতে অব্যাহত থাকবে, কিন্তু প্রাক্-অনুসূর বা পরবর্তী-অনুসূর স্থানে এই স্রোত ক্রমশই স্তিমিত হয়ে আসবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আরও জানা গিয়েছে ধূলো নির্গমনের পরিমাণ বিচার করলে কেন্দ্রীয় অংশের ব্যাসেরও মোটামুটি একটা আন্দাজ করা যায়। যেমন, Bennett ধূমকেতুটার (১৯৭০ সালে দেখা গিয়েছিল) কথাই ধরা যাক। সূর্য থেকে ০·৫৬ জ্যোতিষীয় একক দূরত্বে এই ধূমকেতু থেকে ধূলো বের হওয়ার অনুপাত ছিল প্রতি সেকেণ্ডে ২০ টন। এরই উপর ভিত্তি করে অনুমান করা হচ্ছে তাহলে এই ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশের ব্যাস ছিল ৫·২ কিলোমিটার। ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ থেকে নির্গত এই সব ধূলিকণা জাতে সিলিকেট হয়। এরা সূর্যের বিকিরণ শক্তির দ্বারা তেমন প্রভাবিত হয় না, কিন্তু এরা সূর্যালোক প্রতিফলিত করতে পারে।

পাদটীকা

১ ভাবলে বিস্মিত হতে হয় সুদূর আন্তর্নাক্ষত্র পরিমণ্ডলে কত কিছু রাসায়নিক যৌগ থরে-বিথরে সাজানো রয়েছে। বস্তুহীন শূন্য মহাকাশে শুধুমাত্র যে মৌলিক পদার্থের পরমাণুই আছে বলে জানা গিয়েছে তা নয়, নানান ধরণের যৌগিক পদার্থের অণুও আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন, চার্লস টাউনসের (Charles Towns) তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞানীরা এ্যামোনিয়ার সন্ধান পেয়েছিলেন, আবার কালপুরুষ (Orion) তারামণ্ডলের কাছে যে নীহারিকা (nebula) আছে তার কাছে জলীয় বাষ্পেরও হদিশ পাওয়া গিয়েছে। এইভাবে কখনও

কার্বন মনোক্সাইড আবিষ্কৃত হয়েছে, আবার কখনও বা সায়ানোজেনের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। আজ বিজ্ঞান যেভাবে তার অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে পেরেছে সেখানে অণুতরঙ্গ জ্যোতির্বিজ্ঞান মহাকাশ সম্বন্ধে আমাদের গোটা ধারণাকেই বদলে দিতে চাইছে। মহাকাশে কী ধরণের ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে আছে এবং সেখানে রাসায়নিক বিবর্তন কোন্ ধারায় কাজের পদ্ধতি গড়ে তুলতে চাইছে তার একটা মোটামুটি ধারণা আজ আমরা পেয়েছি। মহাশূন্যে বস্তুকণা যেভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে সেগুলো থেকে বেতার-তরঙ্গ বিকীর্ণ হচ্ছে। সবটা আমরা পাই না। কিছু না কিছু বেতার-তরঙ্গ কেবল পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে। বেতার-তরঙ্গের মাত্রা থাকে, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বোঝা যায়। অণুতরঙ্গ বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র বা microwave spectroscopy-র সাহায্যে জানা যায় কোন্ বস্তুকণা থেকে কী ধরনের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে এবং তার কতটা এই পৃথিবীতে এসে পৌছচ্ছে।

১৬
ধূমকেতুর পুচ্ছভাগ

এবার আমরা ধূমকেতুর পুচ্ছদেশের আলোচনায় আসছি।

আগেই আমরা উল্লেখ করে রেখেছি যে ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের চারধারে গ্যাসীয় আবরণ বা কোমার প্রলম্বিত অবস্থাকে বলা হয় ধূমকেতুর পুচ্ছভাগ। বাস্তবিক ধূমকেতু যেভাবে আকাশে বিশিষ্ট হয়ে দেখা দেয়, তার যত খ্যাতি, যত সৌন্দর্য, সে সব কিছুই তার এই লেজের অংশের জন্য। এই রূপসৃষ্টিতে তাকে যদি আমরা না দেখতাম তাহলে তাকে ধূমকেতু বলে আলাদা করে আর চেনাই যেত না, মনে হত সে অন্য কোন জ্যোতিষ্ক।

ধূমকেতুর গোলাকার গ্যাসীয় আবরণই তার অনন্যসুন্দর রূপ গড়ে তোলে। যদি ছোট মাথা হয়, ধূমকেতুও সেখানে খর্বপুচ্ছ হবে, অথবা তখন এমনও মনে হতে পারে যে শুধুই যেন এক টুকরো পাতলা পাঁশুটে রংয়ের মেঘ আকাশে ভেসে আছে। আর যদি বড় মাথা হয়, তার মধ্যে মালমশলাও বেশী থাকবে, ধূমকেতু সেখানে দীর্ঘপুচ্ছ হবে। ধূমকেতুর গ্যাসীয় আবরণ এমনিতেই বড় হয়, সাধারণভাবে এর ব্যাস ১৬ থেকে ২০ হাজার কিলোমিটার তো হয়ই, ক্ষেত্রবিশেষে এই ব্যাস ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ কিলোমিটারও হতে পারে। কিন্তু গ্যাসীয় আবরণের ব্যাস যে ধরনেরই হোক, ভাববার বিষয় গ্যাসীয় এই খোলসটার মধ্যে কতটা মালমশলা ঠাসভাবে জমা হয়ে আছে।

যাই হোক, এমন অনেক ধূমকেতু আছে যাদের পুচ্ছদেশের দৈর্ঘ আমাদের চমকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ইদানিংকালে দেখা সমস্ত ধূমকেতুদের মধ্যে হ্যালির ধূমকেতু তার প্রকাণ্ড লেজের অংশ নিয়ে আমাদের যথেষ্ট বিস্ময় উৎপাদন করেছে। কিন্তু আরও যদি একটু পিছিয়ে যাই, আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগেকার কথা, ১৮৪৩

সালে আকাশে একটা ধূমকেতু উঠেছিল, এত প্রকাণ্ড যে সহজে যেন কল্পনায় আনা যায় না। অর্ধবৃত্তাকার আকাশের (১৮০°) অন্তত ৭০°-এর পুচ্ছদেশ অধিকার করে থাকত, অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের হিসেব করলে সূর্য থেকে মঙ্গল গ্রহের যতটা দূরত্ব, প্রায় ১৪ কোটি মাইলের মতন এর লম্বা লেজ ছিল। এছাড়া ১৯৪৮ সালের ধূমকেতু কিংবা Arend-Roland (1957 III) নামে ধূমকেতুটার কথাও আমাদের মনে পড়বে। এই দুটো ধূমকেতুরই লেজের দৈর্ঘ আকাশের প্রায় ৩০° স্থান জুড়ে থাকত। কিন্তু যত দীর্ঘই ধূমকেতুর পুচ্ছভাগ হোক, এর না আছে তেমন ঘনত্ব, না আছে ওজন। পৃথিবীর ভরের তুলনায় অন্তত লক্ষ গুণ কম। পাতলা মোলায়েম শ্বেতাভ এই লেজের মধ্য দিয়ে অবারিত দৃষ্টি চলে যায়। সন্ধ্যা-রাত্রির আবছা আকাশে দুটো-একটা করে জোনাকির মতন তারাগুলো যখন ফুটে উঠতে শুরু করে তখন ধূমকেতুর লেজের মধ্য দিয়েও তারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এ-দৃশ্যের গুরুত্ব অসীম। এমন অভিজ্ঞতা সহজে হয় না।

ধূমকেতুর লেজের অংশটা কীভাবে যে গড়ে ওঠে এ কৌতূহল বার বার করে আমাদের মতন সাধারণ মানুষের মনেও যেমন জেগেছে, বিজ্ঞানীরাও এ বিষয়ে বাস্তবজ্ঞান লাভ করার ব্যাপারে তাঁদের তৎপরতা দেখিয়েছেন। পৃথিবীতে বসে ধূমকেতুর মাথার অংশের ভৌতধর্ম এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি জানার বিশেষ হাতিয়ার হল বর্ণালী পরীক্ষার (Spectrum Analysis)[১] কাজ। ধূমকেতুর বর্ণালী পরীক্ষণের কাজে প্রথম যিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি হলেন একজন ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী, নাম দনাতি (G. B. Donati)। তাও একশো বছরের উপর হয়ে গিয়েছে। সেটা ছিল তখন ১৮৬৪ সাল, সেই সময় দনাতি আকাশে Temple's Comet (1864 II) দেখার সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি আসলে নক্ষত্রদের বর্ণালী পরীক্ষার একটা কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে সৌভাগ্যক্রমে ধূমকেতুটা তাঁর নজরে পড়ে গেল।

তাঁর কাজ অবশ্য গভীরে গিয়ে পৌঁছতে পারেনি, কিন্তু তাঁর কিছু উক্তি আজও স্মরণযোগ্য হয়ে আছে।

বর্ণালী পরীক্ষার মাধ্যমে ধূমকেতুর উপাদানগত একটা পরিচয় যে লাভ করা যেতে পারে দনাতির এই প্রাথমিক কাজ তাঁর পরবর্তী সময়ের আরও কিছু বিজ্ঞানীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। যেমন, দনাতির কাজের মাত্র দু-বছর পরে, ১৮৬৬ সালে, ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী সার উইলিয়ামস হাগিন্স (Sir Williams Huggins) এবং আরও একজন ইতালীর বিজ্ঞানী সেক্কি (Secchi) ধূমকেতুর বর্ণালী পরীক্ষার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। ১৮৬৫ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে বিজ্ঞানী হাগিন্স কম করে অন্তত ছটা ধূমকেতুর বর্ণালী পরীক্ষা করেছিলেন। তিনিই প্রথম ধূমকেতুর বর্ণ সমাহারের মধ্যে ফ্রাউনহোফেরের (Fraunhofer) কাল রেখাও আবিষ্কার করেন। আর এখন তো কথাই নেই, বর্ণালী পরীক্ষণ পদ্ধতিকে কত উন্নত স্তরে আজ নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ধূমকেতুর উপাদানগত বৈশিষ্ট নিয়ে আলোচনা করতে বসে বিজ্ঞানীরা একটা বিষয়ে অন্তত একমত হয়েছেন যে ধূমকেতু মহাবিশ্বের প্রাচীনতম উপাদান নিয়েই গঠিত এবং তার মধ্যে যেসব মালমশলা রয়েছে সেসব আজও অনেকটা অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু ধূমকেতু যখন সূর্যের কার্যকরী আওতার মধ্যে চলে আসে তখনই ধূমকেতুর উপাদানের মধ্যে পরিবর্তনের লক্ষণগুলো ফুটে উঠতে থাকে। লেজের প্রসঙ্গে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বিজ্ঞানীরা ভাবতেন সূর্যের আলোই ধূমকেতুর লেজ গড়ে তোলে। তাঁদের এই ধরনের ভাবনার পিছনে যুক্তি ছিল ধূমকেতু যখন আকাশে ওঠে তখন দেখা যায় তার মাথার ভাগটা রয়েছে সূর্যের দিকে মুখ করে, কিন্তু তার লেজের অংশটা সূর্যের বিপরীতমুখো হয়ে মহাশূন্যে এগিয়ে চলেছে। কে যেন তাকে ধাক্কা মারছে, দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে। এতে বিজ্ঞানীরা ভেবে নিয়েছিলেন তাহলে সূর্যের তীব্র আলোই প্রচণ্ড শক্তিতে ধূমকেতুর পুচ্ছদেশকে দূর অঞ্চলে সরিয়ে দিতে চাইছে।

কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালে জার্মান বিজ্ঞানী বিয়েরমান (L.Bierman) সূর্য নিয়ে নানান ধরনের কাজে লিপ্ত ছিলেন। বিশেষ করে তিনি সৌরকণিকাময়ী বিকিরণ বা solar corpuscular radiation সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। ১৯৫৭ সালে আবার বিজ্ঞানী আলফভেন (Alfven), চ্যাপম্যান (Chapman) এবং পার্কার (Parkar) তাঁর কাজকে আরও অনেক দূর এগিয়ে দিলেন। এদের যুক্তি ছিল সূর্যের শুধুমাত্র আলো বা সূর্য থেকে বিকিরিত ফোটনরশ্মি অমন প্রচণ্ড ধাক্কায় ধূমকেতুর মাথার অংশ থেকে গ্যাসীয় ভাগকে দূর-দূরান্তরে ঠেলে দিতে পারে না। সূর্যের বিকিরণই ধূমকেতুর পুচ্ছভাগ গড়ে তোলার মুখ্য কারণ।

সূর্যের দ্বারা এ-কাজটা কীভাবে সম্পন্ন হতে পারে সেই বিষয়ে সংক্ষেপে তাহলে কিছু আলোচনা করে নেওয়া যাক। একটা নক্ষত্র হিসেবে সূর্য হল বিরাট একটা পারমাণবিক চুল্লিঘর এবং সেখানে চলছে পারমাণবিক সংযোজন বা nuclear fusion-এর কাজ। এই কাজের ফলে সূর্য থেকে ঝড়ের আকারে নিয়মিত ঝলকে ঝলকে অতি-বেগুনি রশ্মি, গামা রশ্মি, অবলোহিত রশ্মি, এক্স্ রশ্মি মহাশূণ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। জানা গিয়েছে সূর্যের উপাদানের সিংহভাগ হাইড্রোজেন অধিকার করে আছে। সূর্যের অভ্যন্তর হল জ্বলন্ত, অতি উত্তপ্ত, কেন্দ্র অঞ্চলের তাপমাত্রা প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াস। তাহলে এত উত্তাপে সেখানে হাইড্রোজেন থাকে কী করে? কঠিন, তরল, না গ্যাসীয় অবস্থায়? এর কোন অবস্থাতেই নয়। আর একটা চতুর্থ অবস্থা আছে। সেটা হল প্লাজমা (plasma) অবস্থা। এত উত্তপ্ত অভ্যন্তরে একটা জিনিস বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সেখানকার গ্যাসীয় পরমাণুগুলো সব সময়েই অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে ছুটোছুটি করছে। এর ফলে ওদের পরস্পরের মধ্যে ক্রমাগতই ধাক্কা-ধাক্কি, সংঘর্ষ চলেছে। হাইড্রোজেন পরমাণু অতএব ভাঙ্গছেই। তখন পাওয়া যাচ্ছে ধনাত্মক হাইড্রোজেন আয়ন প্রোটন আর ঋণাত্মক ইলেকট্রন। এই হল প্লাজমা

অবস্থা। অতএব প্লাজমা হল বিদ্যুৎগর্ভ এবং চৌম্বকক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত। এদিকে আমরা জানি সূর্যের উপরিতল অর্থাৎ আলোকমণ্ডল বা photosphere-এর তাপমাত্রা হল ৬০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস। কিন্তু সূর্য থেকে বিদ্যুৎগর্ভ অর্থাৎ আয়নিত সৌরকণা যেভাবে ঝটিকার রূপে উদ্দাম গতিতে সৌরমণ্ডলকে
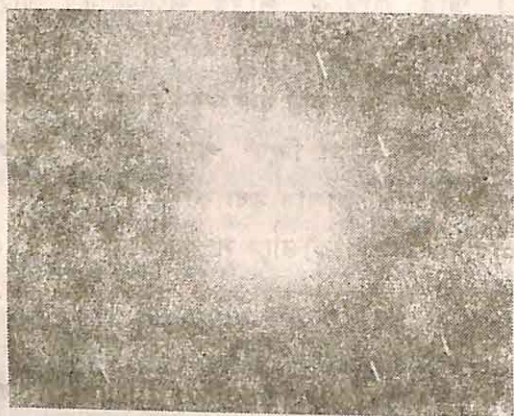
গ্রাস করে নিচ্ছে এই অবস্থায় সূর্যের নিকটবর্তী পরিমণ্ডলে তাপমাত্রা প্রায় দশ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে যায়।

পরিস্থিতিটা এমন যে সূর্যের এই নিবিড় আওতার মধ্যে ধূমকেতুর
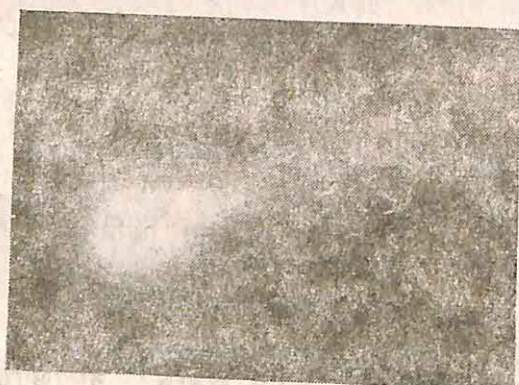
সমগ্র মাথার অংশটা এসে পড়লে তখন আর তার পরিত্রাণের কোন উপায় থাকে না। সৌরঝড় তার উপরে আছড়ে পড়বেই। ফলে

সৌরঝড়ের অকল্পনীয় shook front বা অভিঘাতকারী চাপে ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস থেকে ধূলিকণা এবং বরফের কণিকা বাইরে বিতাড়িত হতে থাকে এবং এই একই পন্থায় কোমার অংশ থেকেও গ্যাসীয় কণার নির্গমন শুরু হয়ে যায়। সোভিয়েত বিজ্ঞানী লেভিন (B. J. Levin) ধূমকেতুর মাথার অংশের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভারী সুন্দর একবার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন গ্যাসীয় পরমাণুগুলো কেন্দ্রীয় অংশের সঙ্গে আঠার মতো আটকে থাকে। যদি দেখা যায় তাপমাত্রা খুবই বেড়ে যাচ্ছে তখন গ্যাস আর নিউক্লিয়াসের দেহ-সংলগ্ন হয়ে থাকতে চাইবে না, আবার তাপমাত্রা যত কমবে ততই গ্যাস আরও বেশী করে কঠিন পদার্থের চারপাশ আঁকড়ে ধরবে। আর হয়ও তাই। কিন্তু কতক্ষণ বা ঠিক কতদিন পর্যন্ত ধূমকেতুর মালমশলা স্রোতের মতন লেজের রূপে বের হতে থাকবে সেটা বলা শক্ত। আসলে ধূমকেতু যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের ঠিক কার্যকরী প্রভাবের মধ্যে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই কাণ্ডকারখানা চলতে থাকবে।

কিন্তু ধূমকেতুর পুচ্ছভাগের শ্রেণীচরিত্র যে এক রকমের হয় না এই সত্যটা প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সোভিয়েত বিজ্ঞানী ব্রেদিখিন (Th. Bredichin), উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়টায়। পরে এই নিয়ে বিজ্ঞানীরা আরও অনেক ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। তিন শ্রেণীতে তাঁরা ধূমকেতুর লেজকে ভাগ করে নিয়েছেন। যেমন,

প্রথম শ্রেণীর পুচ্ছ বা Type I
দ্বিতীয় শ্রেণীর পুচ্ছ বা Type II
তৃতীয় শ্রেণীর পুচ্ছ বা Type III

(১) প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ধূমকেতুর লেজকে বলা হয়েছে প্লাজমা পুচ্ছ। বর্ণালী পরীক্ষায় এরা নীলাভ রংয়ের প্রমাণিত হয়েছে। দৈর্ঘে এরা ধূলিকণায় পূর্ণ লেজের চেয়েও বেশী লম্বা হয়, আর এরা তেমনি সোজা আর তীক্ষ্ণ হয়। সাধারণত যতক্ষণ পর্যন্ত ধূমকেতু সূর্য থেকে ১'৫ থেকে ১ জ্যোতিষীয় একক দূরত্বে এসে হাজির না হচ্ছে ততক্ষণ তার প্লাজমা পুচ্ছ সৃষ্টি না হওয়ারই কথা। পজিটিভ এবং নেগেটিভ কণার মিশ্রণের মধ্য দিয়ে যখন উচ্চ মাত্রায় বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে যায় তখন প্লাজমার সৃষ্টি হয়। সূর্যের মধ্যেও প্লাজমা আছে। আবদ্ধ অবস্থায়। সূর্যের প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন মাধ্যাকর্ষণবলই এই প্লাজমাকে ধরে রাখে। কিন্তু ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশের মধ্যে সূর্যের অনুরূপ এত প্রচণ্ড শক্তিশালী মধ্যাকর্ষণবলের কল্পনাই করা যায় না। সেক্ষেত্রে তাহলে ধূমকেতুর মধ্যে প্লাজমা থাকে কি করে? এক্ষেত্রে আমরা একটা বিকল্প চিন্তা করতে পারি। মাধ্যাকর্ষণবলের প্রাধান্য না থাক, চৌম্বকশক্তি দিয়ে অভাবটা পূরণ করিয়ে নেওয়া চলতে পারে। কেন না আহিত কণার মিশ্রণ হিসাবে প্লাজমার উপর চৌম্বকশক্তির প্রভাব কাজ করে। এখানে আমরা তাহলে প্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন তুলতে পারি যে ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশের কি একটা চৌম্বকধর্ম আছে যা নাকি প্লাজমকে ধরে রাখে?

যাই হোক সূর্য থেকে ধূমকেতুর মাথার অংশটা যখন ১'৫ অথবা ২ জ্যোতিষীয় একক দূরত্বে এসে হাজির হয় তখনই গ্যাসীয় অংশের কার্বন মনোক্সাইড আয়নিত অর্থাৎ বিদ্যুৎগর্ভ হয়ে উঠতে থাকে এবং এই আয়নিত কার্বন মনোক্সাইডই (Co^+) প্লাজমা পুচ্ছের নীলাভ বর্ণ বিচ্ছুরিত করে। অন্য অনায়নিত গ্যাসীয় অণুর সঙ্গে আর যেসব আয়নিত অণু এই প্লাজমা পুচ্ছের মধ্যে ধরা পড়েছে তারা হল Co_2^+, N_2^+, H_2O^+, ইত্যাদি।

সৌরঝড় এত তীব্র বেগে প্লাজমা লেজের আয়নিত কণাদের দূর-দূরান্তে ঠেলে দিতে শুরু করে যে ধূমকেতুর প্লাজমা নামে এই গ্যাসীয় লেজ কখনও বা ১ কোটি কিংবা কখনও

বা ১০ কোটি মিটার পর্যন্ত মহাশূণ্যে পথ করে নিয়ে এগিয়ে চলে।

(২) (৩) দ্বিতীয় শ্রেণী বা তৃতীয় শ্রেণীতে যেসব পুচ্ছকে রাখা হয়েছে তারা ধূমকেতুর গ্যাসীয় উপাদানে গঠিত হয় না। ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয় অংশ থেকে নির্গত ধূলিকণাই এই দু-শ্রেণীর পুচ্ছকে গড়ে তোলে। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর পুচ্ছের মধ্যে গ্যাসীয় লেজের কিছু কিছু পরমাণু পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পুচ্ছের আর একটা বিশেষত্ব হলএর মালমশলা অত্যন্ত শ্লথ গতিতে নির্গত হওয়ার ফলে সাধারণত একটু বাঁকা।

বলতে গেলে প্রায় সাম্প্রতিককালে, ১৯৬৯ সলে, ধূমকেতু সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আর একটা বিষয় আবিষ্কার করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। আজকের দিনে এ-কথা অনস্বীকার্য যে আমরা মহাকাশ যুগ বা Space Age-এ বাস করছি, অর্থাৎ মহাকাশে অনবরতই নানান ধরনের রকেট এবং মহাকাশযান পাঠানো হচ্ছে এবং বিভিন্ন যন্ত্রানুষঙ্গের সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কত গোপন তথ্য আহরণ করা হচ্ছে। ১৯৬৮ এবং ১৯৭০ সালে OAO2 এবং OGO5-এর মাধ্যমে ধূমকেতু সম্বন্ধে এই রকম তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। ১৯৬৮ সালে Comet Tago-Sato-Kosaka সম্বন্ধে এবং ১৯৭০ সালে Comet Bennett সম্বন্ধে। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন এই দুটো ধূমকেতুর চারপাশে বিশাল আয়তনের হাইড্রোজেন গ্যাসের আস্তরণ রয়েছে। Tago-Sato-Kosaka (1969 g) নামে ধূমকেতুটার চারদিকে ভাবা যায় না এত বিশাল হাইড্রোজেন গ্যাসের এক বিকাশ আস্তরণ ধরা পড়েছে। সূর্যের চেয়েও বিশালএর আকার, ১০ কিলোমিটারের মতন পুরু তো হবেই। Tago Sato-Kosaka কিংবা Bennett নামে ধূমকেতুদুটো ছাড়া Comet West নামে ধূমকেতুটার চার দিকেও এইরকম হাইড্রোজেন গ্যাসের অস্তিত্ব আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিষয় হল যেসব ধূমকেতুর চারদিকে হাই-ড্রোজেন গ্যাসের আবরণ ধরা পড়েছে তারাই জানা গিয়েছে খুবই

উজ্জ্বল হয় এবং বলা বাহুল্য উপরোক্ত ধূমকেতুগুলো ইতিমধ্যেই উজ্জ্বলতায় খ্যাতি অর্জন করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল ধূমকেতুর চারিদিকে হাইড্রোজেনের এই আবরণই বা গড়ে ওঠার কারণ কী?

তাহলে ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ বা নিউক্লিয়াসের কথায় আবার একটু ফিরে আসতে হয়। আমরা আগেই অলোচনা করে রেখেছি যে ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশের মধ্যে ধূলিকণা এবং ধাতব পদার্থ ছাড়া জলজমা বরফও রয়েছে। ধূমকেতু সূর্যের কাছে এলে এই জলকণা (H_2O) সূর্যের বিকরণে ভাঙ্গতে থাকে। তখন আমরা পাই হাইড্রোজেন (H) এবং হাইড্রোক্সিল মূলক (OH)। মহাশূন্যে এই হাইড্রোজেন পরমাণু অতিবেগুনি তরঙ্গদৈর্ঘে সংদীপ্ত হয়ে ওঠে। **Lyman-alpha** নামে বিশেষ বর্ণালীরেখায় এই জিনিস ধরা পড়ে। যেসব ধূমকেতু চমৎকার দেখতে, খুবই উজ্জ্বল, তারা যদি সূর্য থেকে ১ জ্যোতিষীয় একক দূরত্বে এসে হাজির হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে এই হাইড্রোজেন প্রতি সেকেণ্ডে ৫০০ কিলোগ্রাম থেকে ১,৩০০ কিলোগ্রাম হারে নির্গত হতে থাকবে। Comet West হল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধূমকেতুর চারদিক হাইড্রোজেন গ্যাসের এই অস্তিত্ব জানার পর বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়ীভূত হয়েছে যে তাহলে ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় ভাগ অত্যন্ত ঠাণ্ডা এবং সেটা জমাটবাঁধা বরফের গঠনেই রয়েছে।

কোন কোন ধূমকেতুর ক্ষেত্রে আর এক ধরণের বিচিত্র পুচ্ছভাগ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। তাকে আমরা বলতে পারি প্রতি-পুচ্ছ বা **anti-tail**। ধূমকেতুর এই প্রতি-পুচ্ছ বাস্তবে কিন্তু ধূমকেতু থেকে নির্গত বস্তুসত্তায় নিয়ে গঠিত হয় না। বরঞ্চ সহজ কথায় বলতে পারা যায় এটা হল এক রকমের দৃষ্টিভ্রমজনিত অদ্ভুত এক ব্যাপার। ধূমকেতু যখন তার কক্ষপথ ধরে সূর্যকে বেড় দিতে থাকে তখন সেই কক্ষতলে ধূমকেতু থেকে নির্গত সূক্ষ্ম ধূলিকণা ছড়িয়ে থাকে। সেই ধূলিকণার উপর সূর্যের আলো পরে প্রতিফলিত হওয়ার কথা

আমাদের জানা আছে। এদিকে পৃথিবীও তার কক্ষপথ ধরে ঘুরে চলেছে। তাহলে পৃথিবীর কক্ষতল ধূমকেতুর কক্ষতলকে ছেদ করবে। এই অবস্থায় সেখানে একটা কৌণিক অবস্থানের সৃষ্টি হবে। যখনই পৃথিবী ধূমকেতুর এই কক্ষতলের সমীপবর্তী হবে তখন সূর্য ধূমকেতুর অভিমুখ সাপেক্ষে পৃথিবী থেকে বিশেষ এক কৌণিক অবস্থায় ধূমকেতুর কক্ষতলের উপর আলোকিত ধূলিকণাগুলোকে আমাদের দেখতে হয় বলে মনে হয় যেন ধূমকেতুর এক লেজ নির্গত হচ্ছে, অর্থাৎ একটা যেন projection effect তৈরী হচ্ছে এবং সেটা সূর্যের বিপরীত দিকে প্রসারিত না হয়ে তীক্ষ্ণ বর্শার ফলকের মতো সূর্যের দিকেই মুখ করে এগিয়ে চলেছে। যেসব ধূমকেতুর ক্ষেত্রে এই এই ধরণের প্রতি-পুচ্ছ দেখা গিয়েছে তাদের মধ্যে Comet Arend-Roland 1985 III হল এক বিশেষ দৃষ্টান্ত। ১৯৫৭ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে এর প্রতি-পুচ্ছের দৈর্ঘ মাপা হতে জানা গিয়েছিল যে সেটা আকাশের প্রায় ১৪° স্থান অধিকার করে ছিল।

পাদটীকা

১ সহজ কথায় আমরা জানি যে আলোর রং আছে। আলোর মধ্যে বর্ণের এই সমাহারকে বর্ণালী spectrum বলা হয়ে থাকে। জ্যোতিষ্ক থেকে উৎসারিত আলো হল তাদের বার্তাবহ। এই আলো পরীক্ষা করলে তাদের হাঁড়ির খবর নেওয়া যায়।

এখন উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডের কথা মনে করা যাক। লৌহপিণ্ড উত্তপ্ত বলার অর্থই হল এর মধ্যকার পরমাণুগুলো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তারা আলো বিকীর্ণ করবে। লৌহ-পিণ্ড থেকে যে-বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যাবে তাতে অবিচ্ছিন্ন লাল থেকে বেগুনি পর্যন্ত সব বর্ণই থাকবে। কিন্তু সেই লৌহপদার্থের চারপাশে যদি, মনে করলাম, সোডিয়ামের ঘেরাটোপ থাকে তাহলে তার থেকে দুটি হলদে বর্ণরেখা নির্গত হবে। শুধু তাই নয় এই সোডিয়াম যেমন

হলদে আলো বিকীর্ণ করে সেই সেই আলো গ্রহণ করারও শক্তি ধরে। এইবার উত্তপ্ত সেই লৌহপিণ্ড থেকে সব রকমই আলো সোডিয়ামের আচ্ছাদন ভেদ করে বাইরে আসবে। কিন্তু এই অবস্থায় দুটি হলদে বর্ণরেখা ভিতর দিকে শোষিত হবে। তখন বর্ণচ্ছত্রের মধ্যে সেই হলদে রংকে কাল বলে মনে হবে।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল ধূমকেতুর মাথার অংশটা ঘণীভূত পিণ্ডবিশেষ। সেটা উত্তপ্ত হচ্ছে। তখন এখান থেকে অবিছিন্ন বর্ণছত্র পাওয়া যাবে। পিণ্ডের চারদিকে কিছু ঠাণ্ডা বাষ্পের একটা স্তর মতনও আছে। হাইড্রোজেন, লৌহা ইত্যাদি মূল পদার্থ বাইরে বের হচ্ছে। কিন্তু আপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাষ্পের আবরণ ভেদ করে আসতে হচ্ছে। অতএব মূল পদার্থ তার বিশিষ্ট রং শুষে নেবে। তার পরিবর্তে কাল রেখা উৎপন্ন হবে।

ফ্রাউনহফের ছিলেন জার্মান বিজ্ঞানী। তিনি বর্ণালী পরীক্ষা করতে গিয়ে তার সর্বাঙ্গে প্রথম কাল রেখার অস্তিত্ব খুঁজে পান। পরে বিজ্ঞানী কির্শফ এই বিষয়ে আরও কিছু কাজ করেন। কিন্তু ফ্রাউনহোফেরকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে। Fraunhofer Lines তাঁর স্মৃতিই বহন করছে।

১৭

ধূমকেতুর দীপ্তি

ধূমকেতুর পুচ্ছ গড়ে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত আকাশে তাকে আবছা অস্পষ্ট সামন্ত্যতম আলোর একটা বিন্দুর মতন মনে হয়। নক্ষত্রদের আপাত উজ্জ্বলতার (apparent magnitude)' সঙ্গে ধূমকেতুর মোটামুটি গড় উজ্জ্বলতার তখন একটা তুলনা করা হয়। সেই হিসেবে দেখা গিয়েছে কোন ধূমকেতুর ঔজ্জ্বল্যের মাত্রা সামান্য বেশী, কারও ঔজ্জ্বল্য আবার খুবই কম। উজ্জ্বলতার অনুপাতে হয়তো কোন ধূমকেতু আকাশের বিশিষ্ট উজ্জ্বল নক্ষত্রদের সমতুল্য দীপ্তিমান হয়ে ওঠে না। কিন্তু দীপ্তিতে মোটামুটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের খানিকটা কাছাকাছি আসতে পারে।

যেমন, ১৮৯২ সালে ৬ই নভেম্বর তারিখে বিজ্ঞানী হোমসের (Holmes) আবিষ্কৃত ধূমকেতুটার কথা আমরা বলতে পারি। নভেম্বর মাসের পর ১৮৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে ধূমকেতুটার সূর্য থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়ার কথা। হোমস তাকে শেষবারের মতন দেখতে চাইলেন। তিনি ভাবলেন ধূমকেতুটা যেহেতু সূর্যের অনুসূর স্থান অতিক্রম করে বিদায় নিচ্ছে অতএব নিশ্চয়ই তাকে খুবই নিষ্প্রভ দেখাবে। কিন্তু তা হল না। দেখা গেল ধূমকেতুটা আগের চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, অষ্টম মাত্রার উজ্জ্বল তারার কাছাকাছি এর দীপ্তি পৌঁছে গিয়েছে। ১৮৯৯ সাল একে আবার দেখা গেল, সেই আগের মতো উজ্জ্বল। কিন্তু ১৯০৬ সালে দেখা গেল এর ঔজ্জ্বল্য আবার হ্রাস পেয়েছে। তারপর থেকে আর দেখা যায় নি। Sehwassmaun Wachmann 1 নামে ধূমকেতুটার কথাও ধরা যাক। বৃহস্পতি এবং শনির মধ্যে হল এর কক্ষপথ। সূর্যের অনুসূরস্থানে যখন আসে তখন সূর্য থেকে এর দূরত্ব হয় ৫·৫১ জ্যোতিষীয় একক

এবং অপসূরের দূরত্ব হয়ে ৭·৩৪ জ্যোতিষীয় একক। এর উজ্জ্বলতার মাত্রা বেশী নয়, খুবই কম, মাত্র ১৮, কিন্তু মজার কথা হল সময় সময় এই ধূমকেতুটাও দীপ্তিতে অন্তত ১০০ গুণ বেশী উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে পারে।

এটাই হল রহস্য। ধূমকেতুদের দীপ্তি অকস্মাৎ এত বেড়েই বা ওঠে কেন? এই নিয়ে প্রচুর জল্পনা-কল্পনা চলেছে, কিন্তু কোন সদুত্তরই এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

বিজ্ঞানী বোব্রোভ্‌নিকফের (Bobrovnikoff) ধারণা, আজ পর্যন্ত আমাদের দেখা তাবৎ ধূমকেতুর মধ্যে কম করে দুই-তৃতীয়াংশের দীপ্তির এই রকম হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। দীপ্তির এই তারতম্য নাকি ১২ থেকে ৬০০ দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

কিন্তু ধূমকেতুর যেটুকু দীপ্তি আছে সেইটুকুই বা সে পায় কীভাবে? সূর্যের আলো ধার করে সে আলোকিত হয়, না নিজের আলো নিজেই সে ছড়িয়ে দেয়?

অনেক আগে বিজ্ঞানীদের সন্দেহ ছিল যে সূর্য কিংবা অন্যান্য নক্ষত্রদের মতো ধূমকেতুরও নিজস্ব আলো আছে, তবে সে আলো জোরালো নয়, স্তিমিত, শুধু তাকে দেখার পক্ষে যথেষ্ট। পরে বিজ্ঞানীরা ধূমকেতুর বর্ণালী নিয়ে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে যখন বিশ্লেষণের কাজে মন দিয়েছিলেন তখন তাঁরা আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে নক্ষত্রদের মতো ধূমকেতু তার নিজস্ব আলো বিকিরণ করতে পারে না। সূর্যের আলো না পেলে সে কোনমতেই আলোকিত হয় না, তবে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন ধূমকেতুর এই দৃশ্যমান হয়ে ওঠার পিছনে দু-ধরনের প্রক্রিয়া কাজ করে। এক হল, ধূমকেতুর পুচ্ছ ভাগের যে-অংশটা ধূলিকনায় পূর্ণ সেটাই সূর্যের আলো প্রতিফলিত করতে পারে। কেন না সূক্ষ্ম ধূলিকণাগুলোয় যখন সূর্যের আলো পড়ে সেই আলো তখন ঠিকরে ওঠে। ধূমকেতুর ধূলোর লেজও এতে দৃশ্যমান হয়। কিন্তু গ্যাসীয় লেজ এইভাবে নিছক সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে দৃশ্যমান হতে পারে না। গ্যাসীয় পরমাণুগুলোকে সূর্যের

আলো প্রতিফলিত করতে হলে অন্য আর এক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে হবে।

সূর্য থেকে নিঃসৃত অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন অতিবেগুনি রশ্মি ধূমকেতুর পুচ্ছের মধ্যে আবদ্ধ বিভিন্ন গ্যাসীয় অনুগুলোকে (molecule) প্রথমে আলাদা আলাদা করে দিয়ে সেগুলোকে ভেঙ্গে দেয়। তখন তৈরী হয় পরমাণু (atom)। ধূমকেতু গ্যাসীয় পুচ্ছের মধ্যে কার্বন(C_2) মিথেন (CH_4), এ্যামোনিয়া (NH_3), কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2), জলকণা (H_2O), সায়ানোজেন (C_2N_2), নাইট্রোজেন (N_2), কার্বন মনোক্সাইড (CO) ইত্যাদি আছে। এখন, সৌর-বিকিরণের প্রভাবে কার্বন মনোক্সাইড, নাইড্রোজেন, হাইড্রাক্সিল ($CO+$ = আয়নিত মনোক্সাইড, $N+$ = আয়নিত নাইট্রোজেন, OH = ধনাত্মক হাইড্রোক্সিল) ইত্যাদি প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত অর্থাৎ আয়নিত হতে থাকে। অর্থাৎ তারা সংদীপ্ত হওয়ার ফলে একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘে সূর্যের আলো শোষণ করে নেয় এবং পরে সেই তরঙ্গদৈর্ঘেই অথবা তার চেয়েও দীর্ঘ তর তরঙ্গদৈর্ঘে সূর্যের শোষিত আলো বিকীর্ণ করতে থাকে। মিলিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘের বেতার উৎসর্জনের মাধ্যমে জানা গিয়েছে ধূমকেতুর মধ্যে উদ্বায়ী (volatile) ছাড়া কিছু স্থায়ী অণুও রয়েছে, যেমন, হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN), মিথাইল সায়ানাইড (CH_3CN), ইত্যাদি। ১৯৭৪ সালে কোহুতেক (kohoutek) ধূমকেতুর মধ্যে উপরোক্ত দুই পদার্থের সন্ধান মিলেছে। বর্ণালী পরীক্ষার সাহায্যে ধূমকেতুর মধ্যে কিছু ভারী পদার্থ, যেমন, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, লোহা, নিকেল এবং ক্রোমিয়ামও পাওয়া যায়। এই জন্যই ধূমকেতুর ধূলার লেজের বর্ণালী হলদে রংয়ের হয় এবং গ্যাসীয় লেজের বর্ণালী উপরোক্ত কারণে নীলাভ হয়।

[১] আজ থেকে দু-হাজার বছরেরও আগে গ্রীক জ্যোতির্বিদ হিপ্যার্কাস (Hipparchus) (খ্রীস্টপূর্বাব্দ ১৪০-১২০) খালি চোখে দেখা আকাশের নক্ষত্রদের আপাত ঔজ্জ্বল্যের মান (apparent magnitudc) অনুসারে তাদের ছ-ভাগে ভাগ করেছিলেন। পরে টলেমি (Ptolemy) তাঁর সেই Star Catalogue

সংশোধন এবং সম্পাদনা করেন এবং তাতে আরও কিছু তথ্য সংযোজিত হয়। সেটি Almagest নামে বিখ্যাত হয়ে প্রচারিত হতে থাকে। যাই হোক, আকাশের সব চেয়ে উজ্জ্বল তারার আপাত দীপ্তি ধরা হয়েছিল ১ এবং সব চেয়ে ক্ষীণ উজ্জ্বল তারার দীপ্তি ধরা হয়েছিল ৬। আজকের দিনে আরও সূক্ষ্মতর হিসেবের প্রচলন হয়েছে। দীপ্তির অনুপাত ২·৫-এর কাছাকাছি ধরা হয়েছে অর্থাৎ কোন শ্রেণীর তারার উজ্জ্বলতা তার পূর্ববর্তী শ্রেণীর তারার উজ্জ্বলতা থেকে ২·০ গুণ কম হবে। পগসনের প্রস্তাব ছিল এই অনুপাতক ২০৫১২ ধরা হক। এই হিসেবমত তাহলে প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র (Ist magnitude star) ষষ্ঠ শ্রেণীর নক্ষত্রের চেয়ে $(২·৫১২)^{৬} = ১০০$ গুণ বেশী উজ্জ্বল হবে।

১৮

ধূমকেতুর ক্ষয়

গ্রহ-নক্ষত্রের কথা আমরা যখন ভাবি তখন মনে হয় ওরা যেন প্রত্যেকেই এক-একটা ভুষুণ্ডির কালকে আঁকড়ে ধরে আছে। ভবিষ্যতেও ওরা আরও কে কত কাল যে আকাশে বহাল তবিয়তে বিরাজ করবে এ-কথাও বলা বড় মুশকিল। কিন্তু ধূমকেতু সম্বন্ধে এ-কথা খাটে না। এক হিসেবে ধূমকেতু সত্যিই বড় ক্ষণজীবী জ্যোতিষ্ক। আজ আছে, কাল নাও থাকতে পারে। যারা অনিয়মিত ধূমকেতু তাদের কথা আমরা না হয় বাদই দিলাম, এমন কি যারা দীর্ঘ-কালীন ধূমকেতু হিসেবে বেশ কয়েক হাজার বছর অন্তর সূর্যের কাছে আসে তাদের কথাও আমরা স্থগিত রাখতে পারি, কিন্তু যারা একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর সূর্যের কাছে আসে, বিশেষ করে যারা স্বল্পকালীন কিংবা সূর্য-ঘেঁষা ধূমকেতু, বার বার করেই যাদের সূর্যকে বেড় দিতে হয়, এবং প্রত্যেক বারই সূর্যের প্রভাবে যাদের নিজেদের দেহ থেকে রসদের যোগান দিয়ে লেজের অংশটা গড়ে তুলতে হয়, খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, তাদের বস্তুমানে ক্রমশই ঘাটতি দেখা দেয়, তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। তারপর একদিন তারা আর পুচ্ছদেশ সৃষ্টি করতে পারে না, এমন কি অনেক সময় তাদের কঠিন কেন্দ্রীয় অংশটাও অখণ্ড অবস্থায় থাকে না, সেটাও অবশেষে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এইভাবে তাদের আয়ু নিঃশেষিত হয়ে যায়, ধূমকেতু হিসেবে আলাদা করে তখন তাদের আর কোন অস্তিত্বই থাকে না।

যদিও সৌর-বিকিরণের দ্বারা সৃষ্ট বৈদ্যুতিক অভিঘাত-জনিত প্রভাবেই ধূমকেতু ধ্বংস হয়ে যায়, তথাপি আরও এমন কিছু কারণ আছে যার জন্য ধূমকেতু পুরোপুরি নষ্ট না হয়ে গেলেও সহজেই

তার আয়ুক্ষয়টা হতে পারে। যেমন, ধূমকেতু বার বার করে যখন সূর্য-পরিক্রমা করে তখন গ্রহদের এলকায় সঞ্চরণশীল নানা বস্তুপুঞ্জের সঙ্গে তার সংঘর্ষ এবং ঘর্ষণ হতে পারে। ফলে ধূমকেতু ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে। এছাড়া, মহাশূন্যে মহাজাগতিক রশ্মি অহরহই ছড়িয়ে পড়ছে। ধূমকেতুর উপর তারও প্রভাব পড়ছে। এতেও ধূমকেতুর আয়ুক্ষয় সম্ভবপর।

যতবার কোন ধূমকেতু সূর্যের অনুসূর-স্থানে আসবে তখন কী হারে তার গ্যাসীয় আবরণের উপাদান খরচ হয়ে যাবে বিজ্ঞানীরা তারও কিছু হিসেব-নিকেশ করেছেন। আপাত সমীক্ষায় জানা গিয়েছে এইরকম অবস্থায় প্রতিবারই ধূমকেতু থেকে তার গ্যাসীয় আবরণের শতকরা ১ ভাগ থেকে অর্দ্ধভাগ খরচ হয়ে যায়। এর অর্থ হল, মনে করা যাক যদি ছোটখাটো কোন একটা ধূমকেতু হয় এবং তার ব্যাস যদি ২ কিলোমিটার হয়, তাহলে তার গ্যাসীয় আবরণের কয়েক মিটার অংশ খরচ হয়ে যাবে।

ধূমকেতুর লেজের অংশ মিলিয়ে যাওয়ার প্রাক্‌-মুহূর্তে অনেক ধূমকেতুই দীপ্তিতে সহসা একটু যেন বেড়ে যায়। তারপরই সব

নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে যাচ্ছে

শেষ। ধূমকেতুর আলো মিলিয়ে যায়। অবশেষে ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের নষ্ট হওয়ার পালা। কঠিন এই অংশটাও মাত্র বার

কয়েক বেড় দেওয়ার পরই ভাঙ্গতে শুরু করে। প্রথমে দুই বা মাত্র কয়েক খণ্ডে ভাগ হয়ে যায়। তারপর ক্রমশই বিচূর্ণিত হতে থাকে। শেষ পরিণতি হয় উল্কাবর্ষণ। কিন্তু কী হারে ধূমকেতুর কঠিন নিউ-ক্লিয়াসের অংশটা বিচূর্ণিত হবে তাও একটু পরখ করে দেখা হয়েছে। প্রতি সেকেণ্ডে এক মিটারের কয়েক দশক ভাগ অনুপাতে ভেঙ্গে যাওয়ার কাজটা চলতে থাকে।

প্রসঙ্গত, অন্য আর একটা কথা আছে। মনে করা যাক কোন ধূমকেতুকে একবার আমরা দেখলাম। কিন্তু পরের বার সূর্যের কাছে আসার সময়ে তাকে আর দেখা গেল না। এই যে না-দেখার ব্যাপার, এর অর্থ এই নয় যে ধূমকেতুটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এমনও হতে পারে ধূমকেতুটা এখনও সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় নি, কিন্তু নানান কারণে সেটা অদৃশ্য হয়ে উঠেছে। যেমন,

(১) ধূমকেতুর লেজের অংশটা এত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে যে, দীপ্তি বলতে এখন আর কিছুই নেই। ফলে তাকে দেখা যাচ্ছে না।

(২) আকাশের এমন এক স্থানে ধূমকেতু আবির্ভূত হয়েছে যে পৃথিবী থেকে তাকে দেখা কোনমতেই আর সম্ভব হচ্ছে না।

(৩) প্রকাণ্ড গ্রহ হিসেবে বৃহস্পতি অথবা শনি কোন ধূমকেতুকে নিজেদের এত কাছে আকর্ষণ করে রেখেছে যে ধূমকেতুটার কক্ষপথ পৃথিবী থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। ফলে দেখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

১৯

ধূমকেতু কি আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক জ্যোতিষ্ক ?

অন্তত বিজ্ঞানীমহলের একাংশ আজ তাই মনে করছেন। অবশ্য বলা বাহুল্য এঁরা যা কিছু বলছেন বিজ্ঞানের আলোকেই আলোচনা করেছেন, সেখানে অতিপ্রাকৃত চিন্তার কোন স্থান নেই। কিন্তু এঁদের বক্তব্যের স্বপক্ষে কিছু কথা যেমন মেনে নেওয়া যায়, বিপক্ষেও প্রচুর বলার আছে।

আলোচনা করা যাক।

এঁরা বলছেন ধূমকেতুর মাথার অংশের অন্তর্গত শক্ত নিরেট পাথুরে নিউক্লিয়াসের চাঁইটা দৈবাৎ কোন কারণে আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে ফেললে আমাদের তখন প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘনিয়ে আসতে পারে। একথা ঠিক, ধূমকেতুর মাথার অংশটা যখন সূর্যের টানে প্রচণ্ড বেগে সূর্যের দিকে ধাবমান হয় তখন তার গতি ক্রমশই বাড়তে থাকে এবং হিসেব কষে জানা গিয়েছে সূর্য থেকে ধূমকেতু যখন ১ জ্যোতিষীয় একক দূরত্বে এসে হাজির হয় তখন তার গতিবেগ হয় ১ সেকেণ্ডে ২৩ মাইল। হয়তো এই রকমের প্রচণ্ড গতিবেগে কোন ধূমকেতু পৃথিবীর একেবারে নাগালের মধ্যে আসার ফলে তার পুরো নিউক্লিয়াসটাই পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে ফেলতে পারে, অথবা কোন একটা বড় ধূমকেতু সূর্যকে বেড় দেওয়ার সময় তার খুব কাছে চলে আসার ফলে সূর্যের প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণের টানে ধূমকেতুটার কঠিন নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে যেতে পারে এবং সেই অবস্থায় তার খণ্ডিত অংশের কোন একটা চাঁই পৃথিবীতে আছড়ে পড়তে পারে।

এই সব সম্ভাব্য ঘটনা-পরম্পরা মেনে নিয়েও আমরা বলব সাধারণভাবে পৃথিবীর সঙ্গে ধূমকেতুর সংঘর্ষ বাধার সম্ভাবনা বড়

ক্ষীণ। কোটিতে গুটিক। কিন্তু কেন? তার কারণই বা কী? প্রথম কথা, ধূমকেতু আর পৃথিবীর কক্ষপথ একই সমতলে থাকে না। আজ পর্যন্ত যত ধূমকেতু সূর্যকে একবার বেড় দিয়ে ঘুরে গিয়েছে তাদের কক্ষপথ গণনা করে এইটুকু জানা গিয়েছে যে কারও কক্ষপথের সমতলই পৃথিবীর কক্ষপথের সমতলীয় নয়। ধূমকেতুর সঙ্গে পৃথিবীর ঠোকাঠুকি লাগতে হলে ধূমকেতুর কক্ষপথ এবং পৃথিবীর কক্ষপথ যে পাতবিন্দুতে (Nodal Point) ছেদ করে সেখানে ধূমকেতুকেও আসতে হবে, পৃথিবীর উপস্থিতিও দরকার। কিন্তু পৃথিবী যে-বেগে ঘোরে এবং ধূমকেতুও যেভাবে সূর্য-পরিক্রমা করে সেখানে এই দুই জ্যোতিষ্ক পরস্পর মুখোমুখি হয়ে কোন সংঘর্ষ তুলে ধরে না।

এখন তর্কের খাতিরে মনে করা যাক নতুন-পুরনো কোন ধূমকেতুর অখণ্ড কোন নিউক্লিয়াস অথবা তার খণ্ডিত কোন অংশ পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে ফেলল। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন, পৃথিবীতে আমাদের ক্ষতির বহরটা কেমন হবে?

পৃথিবীর সঙ্গে ধূমকেতুর সংঘর্ষের প্রশ্নে যাঁরা সোচ্চার তাঁরা বলছেন ক্ষতির পরিমাণটা মারাত্মকই হবে। যদি দশ কিলোমিটারের মতন ব্যাসযুক্ত কোন ধুমকেতুর কেন্দ্রীর অংশ সজোরে পৃথিবীতে আছড়ে পড়ে তাহলে যে-জায়গায় পড়বে সেখানকার মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গিয়ে ১০ থেকে ১০০ কিলোমিটারের মতন চওড়া ফাটল সৃষ্টি করতে পারে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতও শুরু হতে পারে, বাতাসের তাপমাত্রা ৫০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে যেতে পারে, বায়ুর গতি ঘণ্টায় ২০০০ কিলোমিটারের বেগসম্পন্ন হতে পারে, সমুদ্রে পড়লে জলরাশি প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে তীব্র জোয়ারের সৃষ্টি করতে পারে, আর, জনবসতিপূর্ণ স্থানে পড়লে তো কথাই নেই, বিস্তর প্রাণহানি ঘটতে পারে। এই দলের বিজ্ঞানীরা আমাদের আরও মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে ১৯০৮ সালের ৩০শে জুন তারিখে সাইবেরিয়ার তুঙ্গুস্কা (Tunguska) অঞ্চলে ধূমকেতুর বিরাট একটা পাথুরে নিউক্লিয়াস কি মাটিতে আছড়ে পড়ে নি, তাতে পাইনবন কি বিধ্বস্ত

হয়ে যায় নি, মাটি ফেটে গহ্বরের কি সৃষ্টি হয় নি, দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ধূমকেতু পতনের কানফাটা শব্দের অনুরণন কি শোনা যায় নি? কিন্তু তুঙ্গুস্কার ঘটনাকে ধূমকেতুর পতন বলে মনে করে নেওয়াটা হল শুধু অনুমানমাত্র, আসলে যে কী ভেঙ্গে পড়েছিল এটা আজও আমাদের সঠিক জানা নেই। তাছাড়া ধূমকেতু পৃথিবীতে আছড়ে পড়লে ভূমিকম্পই বা হবে কেন, অথবা সমুদ্রে প্রবল জোয়ারই বা দেখা দেবে কেন? বড় জোর সমুদ্রে হয়তো একটু জলস্তম্ভের সৃষ্টি হতে পারে। অন্য কিছু নয়। তবে এটা ঠিক জনবহুল জায়গায় পড়লে কিছু ক্ষতির সম্ভাবনাকে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না।

কিছু বিজ্ঞানী এরই মধ্যেই অভয়বাণীও শোনাতে শুরু করেছেন। এঁরা একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চাইছেন যে যদি দেখা যায় কোন ধূমকেতু সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের টানে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে তৎক্ষণাৎ তাকে নষ্ট করে ফেলার উদ্যোগ নিলেই তো গোল মিটে যায়। আজ হচ্ছে রকেটের যুগ। এবং প্রযুক্তিবিদ্যার নানান সুবিধে-সুযোগগুলোও আমরা কাজে লাগাতে পারছি। মহাকাশ যেন মানুষের মুঠোর মধ্যে চলে আসছে। অতএব এঁরা প্রস্তাব করেছেন পৃথিবীর দিকে ধাবমান কোন ধূমকেতু দেখা গেলেই তাকে নষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাকে লক্ষ্য করে আকাশে একটা রকেট পাঠিয়ে দেওয়া হক এবং তাতে রাখা হক একটা নিউ-ক্লিয়ার বোমা। ধূমকেতুটাকে অনুসরণ করতে করতে সুযোগ বুঝে তার দিকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বোমা নিক্ষিপ্ত হবে এবং তাতে ধূমকেতু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, আমাদেরও কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু এই প্রকল্প কতটা বাস্তবসম্মত সেটাই হল বড় প্রশ্ন।

ধূমকেতুর দ্বারা আমাদের ক্ষতির প্রসঙ্গে অন্য আর এক দৃষ্টিকোণ থেকেও কিছু বিজ্ঞানী তাঁদের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এদের নেতৃত্বে আছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়েল (Fred Hoyle)।[১] এঁদের চিন্তা ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস নিয়ে নয়, কিন্তু ধূমকেতুর গ্যাসীয় পুচ্ছভাগ নিয়ে। এঁরা বলছেন ধূমকেতুর পুচ্ছভাগের মধ্যে কিছু

বিষাক্ত গ্যাসীয় উপাদান রয়েছে, আর তাছাড়া সেখানে ভাইরাসও আছে, ব্যাকটেরিয়াও আছে। এই ধূমকেতুর লেজ যদি পৃথিবীর মাটি ছুঁয়ে যায় তখনই নাকি মহা অনর্থ হতে পারে। বাতাসের দূষণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এমন অনেক রোগ-জীবাণু জমা হতে পারে যে অনেকটাই তখন মহামায়ীর মতন প্রকোপ দেখা দেবে। যেমন, প্লেগ, ব্যাপক হারে ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত কলেরা ইত্যাদি।

ধূমকেতুর মধ্যে কিছু বিষাক্ত সামগ্রী যে রয়েছে একথা আমরাও অস্বীকার করি না। মিথেন, সায়ানোজেন, নাইট্রোজেন, এসব হল খুবই বিষাক্ত এবং ধূমকেতুর মধ্যে এদের বায়বীয় পুচ্ছদেশে নাইট্রোজেনও আছে, অক্সিজেনও আছে। এরা পারস্পারিকভাবে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া গড়ে তুলতে পারে। এই অবস্থায় তখন পাওয়া যায় নাইট্রোজেন অক্সাইড। এই নাইট্রোজেন অক্সাইড বিষাক্ত। এদিকে ধূমকেতুতে জলীয়বাষ্পও আছে। নাইট্রোজেন অক্সাইডের সঙ্গে এই জলীয়বাষ্পেরও রাসায়নিক বিক্রিয়া চলতে পারে। তাতে পাওয়া যাবে নাইট্রিক। বিষাক্ত গ্যাসীয় সামগ্রী হিসেবে এরা আমাদের শরীরস্বাস্থ্যের অবশ্যই অনিষ্ট সাধন করতে পারে। কিন্তু সেটা অন্য কথা। আমাদের কথা হল ধূমকেতুর এই সব বিষাক্ত উপাদানের সঙ্গে আমাদের সংযোগের সুযোগ কতটুকু? আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে ধূমকেতুর লেজের ওজন বা ঘনত্ব বলতে তেমন কিছুই নেই, এত হালকা পাতলা সেই পুচ্ছদেশ, তার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি চলে যায়, নক্ষত্র দেখা যায়। সাধারণ হিসেবে অনুযায়ী কোন ধূমকেতুর পুচ্ছভাগের ১০০০ বর্গ কিলোমিটার পরিমাণ মালমশলা বাতাসের ১বর্গ সেন্টিমিটারেরও কিছু কম হয়। এই অবস্থায় কোন ধূমকেতুর লেজের অংশের মধ্য দিয়ে পৃথিবী যদি চলেও যায় তাহলেও আমাদের ক্ষতির পরিমাণ কি মারাত্মক হতে পারে? অন্তত, উদাহরণস্বরূপ, ১৮৬১ সালের ধূমকেতু এবং ১৯১০ সালে যখন হ্যালির ধূমকেতু আকাশে উঠেছিল তখন তাদের

পুচ্ছভাগ পৃথিবী স্পর্শ করে চলে গিয়েছিলে, কিন্তু তখন অনেকের বহু আশংকাই ধোপে টেঁকে নি। সেই রাতের বেলায় নক্ষত্র ফুটেছিল, সকাল হয়েছিল, পাখিদের কলতান কানে এসেছিল, মানুষজনের মুখও আমরা দেখেছিলাম, যে যার কাজেও নেমে পড়েছিলাম, ধূমকেতুর তথাকথিত বিষাক্ত গ্যাসীয় পুচ্ছভাগ আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারে নি।

অথচ হয়েল এবং তাঁর কিছু সহযোগী দাবী করছেন ধূমকেতুর বিষাক্ত গ্যাসীয় সামগ্রীর দ্বারা আমাদের প্রভূত ক্ষতি হয়, ধূমকেতুর মধ্যে ভাইরাসও কিছু কিছু বিষাক্ত রোগের মড়ক পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু সুদূর মহাশূণ্যের পরিমণ্ডলে ভাইরাস ঘুরে বেড়াচ্ছে কিনা এটা একটা খুব জটিল প্রশ্ন। নানা জনে এ নিয়ে প্রচুর অনুমান, তর্কবিতর্ক করছেন। কিন্তু প্রমাণ সহযোগে কোন কিছু এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তথাপি আশ্চর্যের ব্যাপার হয়েল অনুমানকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন।

যাই হক, যদি তর্কের প্রয়োজনেও হয়েলকে সমর্থন করতে হয় যে ধূমকেতুর মধ্যে ভাইরাস আছে সেক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন আছে।

যেমন, প্রথম কথা, পৃথিবী সূর্যের মোটামুটি কাছেই আছে। অতএব ধূমকেতুর ভাইরাসকে অমাদের পেতে হলে সূর্যের অপেক্ষাকৃত কাছের পরিমণ্ডল পার করে সেই ভাইরাসকে নেমে আসতে হবে। কিন্তু সূর্যের কাছাকাছি পরিমণ্ডলে সূর্যের প্রচণ্ড বিকরণশক্তি কাজ করছে। সেখানে নানান প্রতিকূলতাও রয়েছে। ভাইরাসের উপর তার একটা প্রভাব পড়বেই। এই সব প্রতিকূল প্রভাব কাটিয়ে ভাইরাস কতটা তার জীবনীশক্তিকে অক্ষুন্ন রেখে অটুট অপরিবর্তিত অবস্থায় নেমে আসতে পারে এটা হল একটা বিশেষ প্রশ্ন। কিন্তু হয়েল এখানে নিশ্চুপ। তিনি কোন ব্যাখ্যাতেই যেতে চান নি।

দ্বিতীয়ত, ধূমকেতুর পুচ্ছভাগের ঘনত্ব যেখানে সামান্যমাত্রই

বলা চলে সেখানে ধূমকেতুর মধ্যে ভাইরাস যদিও বা থাকে নিশ্চয়ই তা বিপুল পরিমাণে নয়, নামমাত্র আছে বলেই মনে করতে হবে। অথচ ধূমকেতুর এই ছিটেফোঁটা ভাইরাস নিয়েই হয়েল দাবী করতে চান যে তার দ্বারা মড়ক-মহামারী ইত্যাদি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে? আমাদের চারপাশে বাতাসের মধ্যেও ভাইরাস আছে। কিন্তু তাই বলে কি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভাইরাস থিক থিক গিস গিস করছে? তা তো আর নয়। তাহলে তো আমাদের বেঁচে থাকাটাই দুষ্কর হয়ে উঠত। এখানেও সমস্ত বিষয়টা সম্বন্ধে হয়েল কোন জবাবই দেন নি।

তারপর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে সেই ভাইরাসকে পৃথিবীতে নেমে আসতে হবে। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বেশ কিছু স্তরভাগ আছে। এই বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ভ্যান এলেন বেষ্টনী (Van Allen Belt) বা অনেক উপরের দিকে আয়নমণ্ডল (Ionosphere) নানান মহাজাগতিক মারণরশ্মিকে প্রতিহত করছে। সূর্যরশ্মির সবটুকু আমরা পাই না। আমাদের বায়ুমণ্ডলে অনেকখানিই প্রতিহত হয়। অথচ ধূমকেতুর ভাইরাস নির্বিবাদে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে পৃথিবীতে পৌঁছবে, কোথাও কোন বাধার সম্মুখীন হবে না, কোন অবস্থায় এতটুকু তার রূপান্তর ঘটবে না, এমন কথা কি বিশ্বাস করা যায়? হয়েল যদি এখানে খোলাখুলি বিস্তারিত কিছু আলোচনা করতেন তাহলে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হত। কিন্তু তিনি তা করেন নি।

হয়েল আরও বলেছেন যে ধূমকেতুর ভাইরাস প্লেগ, কলেরা, ব্যাপক ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি রোগের জীবাণু পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের ভেবে দেখতে হবে এই ধরণের কথা বলার পিছনে তাঁর যুক্তির জোর কতখানি? আশ্চর্যের কথা এখানেও হয়েল দাবী তুলেই খালাস, বিশেষভাবে কোন কিছুই ব্যাখ্যা করেন নি।

আমাদের কথা হল ভবিষ্যতে বিজ্ঞান যদি কোনও দিন প্রমাণ করতে পারে যে ধূমকেতুর মধ্যে ভাইরাস আছে এবং সেই ভাইরাস

ব্যাপক মাত্রায় পৃথিবীতে নেমে আসছে এবং হয়েল প্রস্তাবিত বিশেষ বিশেষ রোগ ছড়িয়ে দিচ্ছে, সেদিন নিশ্চয়ই আমরা হয়েলকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাব। কিন্তু এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আমাদের যে সব সংশয় রয়েছে যতক্ষণ না পর্যন্ত তার নিরসন হচ্ছে ততক্ষণ হয়েলের বক্তব্যকে বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই গুরুত্ব দিতে চাইবেন না।

পাদটীকা

১ Professor Sir Fred Hoyle এবং Dr. Chandra Wickramasinghe (ইনি ভারতীয় নন, সিংহলী)। এঁরা উভয়েই একটি গ্রন্থের প্রণেতা। নাম, Evolution from Space।

২০

ধূমকেতু কি প্রাণসৃষ্টির সহায়ক ?

স্যার ফ্রেড হয়েল আরও একটা অভিনব কথা বলেছেন।

এতকাল আমরা জানতাম পৃথিবীর আবহমণ্ডল একদা সূর্যের পরিমণ্ডল থেকে জীবন সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করেছিল এবং তারপর এখানে অনুকূল পরিস্থিতিতে একদিন যখন সমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছিল তখন ধীরে ধীরে কালক্রমে সেই জলের মধ্যে জেগে উঠেছিল আদি-প্রাণ। পৃথিবীতে জীবনসৃষ্টির প্রচলিত এই ধারণাকে হয়েল মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর ধারণা পৃথিবীতে জীবনসৃষ্টির মূলে হল ধূমকেতু। যেহেতু বিজ্ঞানীদের অনেকে ধূমকেতুর মধ্যে জৈব অণু আছে বলে মনে করেছেন, অতএব হয়েল প্রশ্ন তুলেছেন এই ধূমকেতু কোন এক কালে জীবনসৃষ্টির উপাদান পৃথিবীতে বয়ে নিয়ে এসেছিল এবং তার থেকে এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে। শুধু তাই নয় পৃথিবীতে সমুদ্রসৃষ্টির মূলেও তিনি ধূমকেতুর ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

হয়েলের বক্তব্য আমরা আলোচনা করব, কিন্তু তার পূর্বে পৃথিবীতে জীবনসৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা নিয়ে একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক।

পৃথিবীর জন্মলগ্নের ঠিক পরের মুহূর্তগুলোয় পৃথিবী ছিল নগ্ন, রুক্ষ, তার চারপাশে আবহমণ্ডলের ছিটেফোঁটাও তখন গড়ে ওঠে নি। তখন না ছিল ওজোন (ozone) স্তর, না ছিল ভ্যান এ্যলেন বেষ্টনী। কিন্তু সৌরমণ্ডলের পদার্থ কণিকা ধীরে ধীরে জমাট বাঁধতে শুরু করল। পরের পর্যায়ে মৌলের ক্ষয়ও শুরু হল আর ভূস্তরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে তুলল। এটা ছিল প্রাক্ জৈবিক পরিস্থিতি। এই অবস্থায় অতিবেগুনী রশ্মি, গামা-রশ্মি এক্স-রশ্মি' অবলোহিত রশ্মি, তেজস্ক্রিয় কণা, হাই-

ড্রোজেন নিউক্লিয়াস, কার্বন, হিলিয়াম ইত্যাদি পৃথিবীকে তখন নিয়তই স্নান করিয়ে দিচ্ছিল। এদের মধ্যেই জৈবিক উপাদানগুলো ছড়িয়ে ছিল। বুঝতে অসুবিধে হয় না সূর্যের পরিমণ্ডল থেকেই এই সব জৈবিক উপাদান স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবীতে জমা হতে থাকে। এইভাবেই পৃথিবীর চারপাশে বায়ুমণ্ডল গড়ে উঠতে শুরু করে। অবস্থাটা তখন এমনই ছিল যে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে প্রচণ্ড উত্তাপে হাইড্রোজেন, এ্যামোনিয়া, নাইট্রোজেন প্রভৃতি ঘনীভূত হল না, তারা বায়ুমণ্ডলেই রয়ে গেল। আর এদিকে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত চাপ এবং তাপেও নাগাড়ে পৃথিবীতে ভূমিকম্প লেগে রইল। হাজার হাজার বছর ধরে সমানে এই কাজ চলল। এর ফলে পৃথিবীর পাথরের মধ্যে বন্দী গ্যাসও বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল। এইবার ভূগর্ভ থেকে নিস্ক্রান্ত জলীয় বাষ্প ক্রমশই জলে পরিণত হতে শুরু করল। হাজার লক্ষ বছর ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির বর্ষণ পৃথিবীর বুকে সমুদ্র সৃষ্টি করল। জলের মধ্যে মিশে রইল গ্যাস, আবার বাতাসের মধ্যেও জলীয় বাষ্প এবং গ্যাস মিশে রইল। অবশেষে জলীয় দ্রবণের মধ্যে যখন রাসায়নিক বিক্রিয়ার কাজ শুরু হল তখন সেখানে তৈরী হল এ্যামিনো এ্যাসিড। প্রাণের মূল উপাদান হল প্রোটিন বা অ্যাসিড জাতীয় অণু। এই প্রোটিন এল এ্যামিনো এ্যাসিড থেকে। এইভাবে আনুমানিক তিনশো কোটি বছর আগে এ্যামিনো এ্যাসিডের সাহায্য নিয়েই সৃষ্টি হয়েছিল প্রাথমিক জীবকোষ। তারপর নানান পরিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সৃষ্টি হয়েছিল জটিল প্রাণ। সৃষ্টি হল উদ্ভিদ। এবং তার আরও পরে প্রাণীজগৎ।

অথচ হয়েল যখন বলছেন এই ধূমকেতুই পৃথিবীতে জীবনসৃষ্টির উপাদান বহন করে নিয়ে এসেছিল, এই ধূমকেতুই সমুদ্রসৃষ্টি করেছিল, এই ধূমকেতুর মধ্যেই ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব আছে, তখন অনুমান হয় তিনি অপরাপর বিজ্ঞানীর ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

বর্তমান শতকের সত্তরের দশকে সোভিয়েত একাডেমি অফ

সায়েন্সেস দ্বারা পরিচালিত লেনিনগ্রাডের ফিজিক্যাল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিটিউটের বিজ্ঞানী ইয়েভগেনি কাইমাকভ (Ivegeny Kaimakov) তাঁদের পরীক্ষাগারে ধূমকেতু তার আদি আস্তানায় যে পরিবেশে থাকে তার আবহলগুল এবং ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের একটা মডেল তৈরী করেছিলেন। ভ্যাকুয়াম চেম্বার বসিয়ে সেখান থেকে সূর্যের অনুরূপ বিদ্যুৎগর্ভ স্ফুলিঙ্গ এবং বিকিরণের ব্যবস্থা করে পর্যায়ক্রমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জমাটবাঁধা বরফের উপর এবার ওই বিকিরণরশ্মির বর্ষণ চালানো হল। দেখা গেল তীব্র তাপমাত্রায় বরফের মধ্যকার মালমশলা ছাড়া পাচ্ছে। এই অবস্থায় অতি সূক্ষ্ম সরু সরু সুতোর আকারে বরফের রড পাওয়া গেল। তাতে স্প্রিংয়ের মতন পলিমার জড়িয়ে রয়েছে। পলিমার এবং পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে প্রাণ। পরীক্ষালব্ধ এই ফলাফলকে ভিত্তি করে কাইমাকভ এই উপসংহারে আসতে চেয়েছেন যে প্রাণসৃষ্টির ব্যাপারে ধূমকেতুর একটা সম্ভাব্য ভূমিকা আছে। কিন্তু এটাকেই তিনি তাঁর দাবী হিসেবে তুলে ধরে সরব হন নি। অথচ বিস্ময়ের কথা হয়েল ধরেই নিয়েছেন ধূমকেতুর দ্বারা পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সূচনা হয়েছিল।

তারপর ১৯৬৪ সালে জাপানী বিজ্ঞানী হাইয়াতস উল্কাণু নিয়ে পরীক্ষার সময় তার মধ্যে দু-রকম পদার্থের আবিষ্কার দাবী করেছিলেন। এরা হল রাসায়নিক যৌগ। একটা হল এ্যাডেলাইন, আর অন্যটা হল গুয়ানাইন। এরা জীবনসৃষ্টির মূল উপাদান ডি. এন. এ. এবং আর. এন. এর. সঙ্গে সংপৃক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু হাইয়াওসের বক্তব্য, সত্যি কথা বলতে কি, এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা নিঃশর্তে মেনে নেন নি এবং, এমন কি কি, উল্কাণুর মধ্যে ভাইরাস আছে এ দাবীও আজ সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করে নি। কিন্তু হয়েল কি এই হাইয়াওসকেই স্বাগত জানতে চাইছেন?

প্রসঙ্গত আমরা প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্ভানতে আরেনিউসের (Svante Arrheneus)[১] কথাও তুলতে পারি। তিনি বিশ্বাস করতেন অতিনৈসর্গিক কোন পরিমণ্ডলেই জীবনসৃষ্টির মূল উপাদান

তৈরী হয়ে আছে এবং উল্কাই সেই সব উপাদান একদা পৃথিবীতে বহন করে নিয়ে এসেছিল এবং তার দ্বারাই পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ হয়েছে। কিন্তু আরেনিউসের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও বিজ্ঞানীরা তাঁর এই মতবাদকে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু মনে হচ্ছে হয়েল যেন আরেনিউসকেই অনুকরণ করে চলেছেন। কেবল পার্থক্যটা এই উল্কার স্থানে তিনি ধূমকেতুকে বসিয়ে দিতে চেয়েছেন। যেন পুরনো একটা তত্ত্বকে নতুন বোতলে পুরে পেশ করার ব্যাপার।

আমরা আগেও বলেছি, এখনও বার বার করে বলব, ধূমকেতু খুবই প্রাচীন জ্যোতিষ্ক এবং সৃষ্টির সময় থেকে আজও পর্যন্ত ধূমকেতু তার আদিম দেহে যেভাবে অবিকৃত অবস্থায় আছে এইভাবে বিবর্তনের প্রভাবকে এড়িয়ে চলা পৃথিবী বা অন্য কোন গ্রহের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এই কারণে ধূমকেতুর মধ্যে কিছু জৈবিক উপাদান থাকা খুবই সম্ভবপর। হতে পারে পৃথিবীতেও জীবনসৃষ্টির ব্যাপারে ধূমকেতুর অন্যতম কোন ভূমিকা থাকলেও থেকে থাকতে পারে, কিন্তু ধূমকেতুই এই ব্যাপারে একমাত্র নায়কের ভূমিকা পালন করেছিল, পৃথিবী সেখানে তার নিজস্ব অবদানকে বড় করে তুলতে পারে নি, এই দাবী যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিশ্লেষিত করা চলে?

পাদটীকা

১. আরেনিউস (১৮৫৯—১৯২৭) ছিলেন সুইডেনের লোক, নোবেল পুরস্কারবিজেতা (১৯০৩) এবং আধুনিক ভৌতিক রসায়ন-বিদ্যার (Phyical Chemistry) জনক। জীবনের শেষভাগে তিনি মহাশূন্যে প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা শুরু করেন।

২১

ধূমকেতু ও প্রাগৈতিহাসিক জীবের অবলুপ্তি

পৃথিবীর ইতিহাস বলে আজ থেকে ৬ কোটি থেকে ২৫ কোটি বছর আগে সেই কোন প্রাগৈতিহাসিক কালে, পৃথিবীতে যখন মধ্যজীবীয় যুগ অর্থাৎ Mcsozoic Age চলছে, তখন অতিকায় সব প্রাণীরা পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে বেড়াত। যেমন, ডাইনোসর, টাইরানোসরাস, ব্রন্টোসরাস ইত্যাদি। তারপর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। নানান প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার চাপে একদিন তারা ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে অবলুপ্তও হয়।

বিজ্ঞানীদের নিরলস পরিশ্রম এবং গবেষণা এই সব প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করার ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। পৃথিবীর নানান স্থানে এঁরা খননকার্য চালিয়েছেন। ভারতেও এ-কাজ হয়েছে। মাটির নিচে শিলাস্তরে নানান রকম জীবাশ্মের সন্ধান করে বিশেষজ্ঞরা আজ বলতে পারছেন প্রাগৈতিহাসিক এই সব জীবের আকার-আকৃতি এবং পৃথিবীর বুকে এদের চলাফেরা এবং জীবনযাত্রার পদ্ধতি কেমন ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের আদিলাবাদ জেলার ইয়ামানপল্লীতে খননকার্য চালিয়ে যে-জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে পূর্ণ রূপে সেই ডাইনোসর বিশালকায় এক জীব ছিল বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। লম্বায় অন্তত ১৫ মিটার। এরা বিপুলায়তন দেহভার নিয়ে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় দ্রুত এক স্থান থেকে দূর স্থানান্তরে চলে যেতেও পারত না। বাস্তবিক এই জাতীয় প্রাণীদের বেঁচে থাকাটাই ছিল যেন একটা বিড়ম্বনা।

অথচ ভাবলে বিস্মিত হতে হয় এক-আধ শতাব্দী নয়, দীর্ঘ ১৭/.৮ কোটি বছর এরা পৃথিবীতে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় এই সব জীবেরা

পৃথিবী থেকে কীভাবেই বা লোপ পেয়ে গেল ঠিকমতো এর উত্তর পাওয়া মুশকিল। নানা কারণের সঙ্গে মনে হয় দুটো মুখ্য কারণ এর পিছনে রয়েছে। একটা হল আগ্নেয়গিরির উৎপাত, আর দ্বিতীয়টা হল পৃথিবীতে তুষারযুগের আবির্ভাব।

পৃথিবীতে যখন ডাইনোসর জাতীয় প্রাণীদের আধিপত্য চলছে তখন এখানে ঘন ঘনই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত লেগে থাকত। একদিকে যেমন গলন্ত উত্তপ্ত লাভাস্রোত পৃথিবীর উপর দিয়ে বিভীষিকার সৃষ্টি করে বয়ে যেত, তেমনি আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত প্রচুর পরিমাণে ধূলো, গ্যাস ইত্যাদি বাতাসে মিশে গিয়ে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে পুরু একটা আস্তরণের সৃষ্টি করত। ধূলো ইত্যাদির দ্বারা এইভাবে পৃথিবীর আকাশে ধোঁয়াসার মতন এমনই একটা আচ্ছাদন গড়ে উঠত যে সূর্যের স্বাভাবিক আলো, রশ্মি, তাপ সব কিছুই ব্যাহত হত। ফলে পারিপার্শ্বিক উষ্ণতা কমে এসে একটা শৈত্য-প্রবাহের সৃষ্টি হত। গাছপালার জন্য যে-সালোকসংশ্লেষের (photosynthesis) দরকার হয় তার অভাবও দেখা দিত। তৃণভোজী ডাইনোসররা এতে মহা সংকেট পড়ত, সুষ্ঠুভাবে প্রাণ ধারণ করে থাকাটাই তাদের পক্ষে সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।

কিন্তু বহু বিজ্ঞানী আগ্নেয়গিরির চেয়েও তুষারযুগের প্রভাবে প্রাগৈতিহাসিক জীবদের অবলুপ্তির উপর জোর দিয়েছেন। আমাদের পৃথিবীর বয়স্ নির্দ্ধারণ করা হয়েছে আনুমানিক ৪৬০ কোটি বছর। এ পর্যন্ত চার থেকে ছ'টি তুষারযুগ পৃথিবীতে নেমে এসেছিল বলে অনেক মনে করছেন। তুষারযুগ যখন শুরু হয় পৃথিবীর আবহমণ্ডলের তাপমাত্রা তখন নেমে আসে। এবং নামতে নামতে হিমাঙ্কের নিচে চলে যায়। তখন বিস্তীর্ণ ভূভাগ বরফে ঢাকা পড়ে যায়। মেরু অঞ্চল থেকে জমাটবাঁধা বরফ নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে ধীর গতিতে এগোতে থাকে এবং পাহাড়ী অঞ্চল থেকেও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হিমবাহ সমতলভূমি অভিমুখে নেমে আসে।

উদ্ভিদকূল এতে বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত হয়। নদী, হ্রদ, এমন কি সমুদ্র পর্যন্ত কঠিন বরফের আস্তরণে ঢাকা পড়ে যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ নিচে নেমে যায়, নতুন শিলাস্তর জেগে ওঠে, পাহাড়েরও সৃষ্টি হয়। ভূপৃষ্ঠের বিশাল অংশের অনেক কিছুই এইভাবে ওলট-পালট হয়ে গিয়ে জল-খাদ্য-উষ্ণতা-আশ্রয়ের অভাব বড় করে তুলে ধরে। দীর্ঘকাল এই অবস্থা চলতে থাকে। ডাইনোসর জাতীয় প্রাণীদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ উষ্ণ অঞ্চলে সহজে পালানোও সম্ভব ছিল না। ফলে তারা নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত।

উষ্ণযুগ এবং হিমযুগের মধ্যে আসা-যাওয়ার সময়ের একটা ফারাক বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন। চক্রাকারে একটা যেন নিয়মানু-বর্তিতা পালনের ব্যাপার। এক-একটা উষ্ণযুগের ব্যাপ্তি ছিল প্রায় ২৫ কোটি বছর। তারপরই নেমে আসত তুষারযুগ। আজ থেকে দেড়-দু কোটি বছর আগে এই রকম একটা তুষারযুগ পৃথিবীতে শেষ নেমে এসেছিল বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। কিন্তু কেন, এই ধরনের সময়ের পরিসীমা মেনে তুষারযুগের পৃথিবীতে নেমে আসার কারণটাই বা কী? এটাই হল অদ্ভুত ব্যাপার, একটা যেন প্রহেলিকা। নানা জনে বিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন, কিন্তু কোন সদুত্তরই আমাদের মনে ধরে নি। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞানীরা যেসব তর্কবিতর্ক করেছেন সেসব আমরা আলোচনা করব না। এখানে তার প্রাসঙ্গিকতাও নেই। কেবল তুষারযুগের সঙ্গে বিজ্ঞানীরা যেভাবে ধূমকেতুকে যুক্ত করে তর্কের সৃষ্টি করতে চাইছেন সেই প্রসঙ্গের আলোচনাই আমরা যথাযথ মনে করতে পারি।

এই সূত্রে ১৪ অধ্যায়টি আপনাদের আর একবার পড়ে নিতে-বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। সূর্যের প্রস্তাবিত সঙ্গী-নক্ষত্র সেই শ্বেতবামন নক্ষত্রটির কথা স্মরণ করুন।

এক দল বিজ্ঞানী প্রবলভাবে অনুমানই করছেন পৃথিবীতে তুষার-যুগ আগমনের মূলে সূর্যের এই সঙ্গী-নক্ষত্রই যেন ধূমকেতুদের লেলিয়ে দেয়। এঁদের মতে সূর্যের এই সঙ্গী-নক্ষত্র মহাশূন্যের কোন্ গহন

প্রদেশ থেকে Oort Eloud-এর মধ্য দিয়ে চলার পথে সেখান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে হাজারে হাজারে ধূমকেতুকে নিজের অভিকর্ষের জোরে এমনিভাবে উৎখাত করে যে তারা সোজা একেবারে সূর্য-পৃথিবীর কাছে চলে এসে পৃথিবীর আকাশ ভরিয়ে ফেলে। এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক আবার সরাসরি পৃথিবীর বুকে আছড়েও পড়ে। তখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ধূমকেতুর প্রচণ্ড ঘর্ষণ এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর বুকেও ধূমকেতুর আঘাতের দরুণ অকল্পনীয় উত্তাপের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর আকাশও ধূলিকণায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সব সময়েই তখন ধূলোর মেঘে সূর্য এমনিভাবে ঢাকা পড়ে যায় যে ধীরে ধীরে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘনিয়ে আসে। শীতের প্রকোপ এই অবস্থায় পৃথিবীকে যেন গ্রাস করে নেয়। এই প্রতিকূল পরিবেশই বিরাট জৈবিক অবলুপ্তি ডেকে আনে।

ধূমকেতুর দ্বারা জৈবিক অবলুপ্তির কারণ আমরা মানতে রাজি আছি, কিন্তু যাঁরাই এসব কথা বলেছেন তাঁদের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত কিছু প্রশ্নের উত্তরও আমরা পাই নি। ফলে আমাদের সন্দেহ এবং বিভ্রান্তি বাড়ছে বই কমছে না।

বিজ্ঞানীরা নিজেরাই বলছেন সূর্যের সঙ্গী-নক্ষত্র আকারে তেমন কিছু বড় নয়, তার ভরও সূর্যের তুলনায় খুবই কম। তাহলে এই জাতীয় নক্ষত্র কি Oort প্রস্তাবিত ধূমকেতুরাজ্য থেকে হাজারে হাজারে ধূমকেতুকে উৎখাত করতে পারে? এটা যেমন একটা প্রশ্ন তেমনি ছোট-বড় আকারে কিছু সংখ্যক ধূমকেতু পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়লেই কি ব্যাপকভাবে ঘন ধূলোর মেঘ আকাশে জমা হয়ে সূর্যকে ঢেকে ফেলতে পারে? তারপর জ্যোতিষ্ক হিসেবে ধূমকেতু তো গতি-শীল, সূর্যের কাছে এলেও তারা সেখান থেকে অবশেষে সরে যায়। এই অবস্থায় এরা কেমনভাবে যে দীর্ঘকাল সূর্যকে ঢেকে রাখতে পারে সেটাও ঠিক বাস্তবে আমরা বুঝে উঠতে পারি না।

একথা ঠিক যে বিজ্ঞান সত্য প্রতিষ্ঠিত করে। অনুমানকেও আশ্রয় করে বিজ্ঞান এগোয়। কিন্তু সেখানে কল্পনার স্থান থাকে

না। বিশ্লেষণনির্ভর যুক্তিগ্রাহ্য অনুমানই হল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করার চরম প্রাক্-অবস্থা। কিন্তু কোন কিছুর মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রবণতা অনেক বিজ্ঞানীদের মধ্যেও দেখা যায়। সেটা নিশ্চয় বিজ্ঞানের দোষ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভাবতে হবে ধূমকেতু সত্যি কি তুষারযুগের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারে, ধূমকেতুর দ্বারা প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর জাতীয় জীব এবং এমন কি, আদিম মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রজাতিরও বিলোপ কি সম্ভবপর ?

২২

ধূমকেতু ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কীয় পদার্থ

গ্রহ-উপগ্রহ বা নক্ষত্রের সঙ্গে ধূমকেতুর সম্বন্ধে খোঁজার চেষ্টা করা বৃথা। ওরা এতই আলাদা জাতের জ্যোতিষ্ক। কিন্তু আকাশে তো আরও কত জ্যোতিষ্ক আছে, তাদের মধ্যে আর কারও সঙ্গে কি ধূমকেতুর কোন সম্পর্কই স্থাপন করা যায় না?

এই সূত্রে বিজ্ঞানীরা উল্কা এবং এ্যাসটেরয়েড়ের (asteroid)[১] প্রসঙ্গ তুলেছেন। কেউ কেউ[২] আবার ধূমকেতুর সঙ্গে টেকটাইটকেও (tektite) যুক্ত করে দিতে চাইছেন।

টেকটাইট দিয়েই আমাদের আলোচনা আমরা শুরু করছি, কিন্তু মজার কথা হল, টেকটাইটের আদি-উৎপত্তি, প্রকৃতি সম্বন্ধে সব রহস্য আজও আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় নি এবং সেই হিসেবে বিজ্ঞানীরা যে যাই বলুন টেকটাইটের সঙ্গে ধূমকেতুর সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস আমরা উচিত বলে মনে করি না। টেকটাইট হল এক অদ্ভুত জাতের জ্যোতিষ্কীয় পদার্থ, তাকে আকাশে দেখা যায় না, খালি চোখে তো নয়ই, এমন কি শক্তিশালী দূরবীনযন্ত্রও এখানে অচল। টেকটাইটকে আমরা আমাদের এই পৃথিবীতেই পেয়েছি তাও যত্রতত্র নয়, কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বাছাই করা অঞ্চলে (পর পৃষ্ঠায় রেখাচিত্র দ্রষ্টব্য)। অথচ টেকটাইট কিন্তু পৃথিবীজাত কোন কিছু নয়। আগে অবশ্য আমরা তাই ভাবতাম। তখন মনে করা হত ওরা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফসল, গলিত লাভা থেকে এরা পরে ঠাণ্ডায় ঘনীভূত হয়ে বর্তমান রূপ নিয়েছে। এখন বলা হচ্ছে ওরা মহাজাগতিক পরিমণ্ডলেই সৃষ্ট হয়েছে। পরে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। কিন্তু মহাশূন্যের কোন্ পরিমণ্ডলে এদের সৃষ্টি হয়েছে, এদের সৃষ্টির পিছনে কী কী কার্যকারণ কাজ করছে, কত দিন আগেই বা এদের সৃষ্টি হয়েছে, কী কারণেই বা

এরা পৃথিবীতে নেমে এল, এর কোন ব্যাখ্যাই কেউ দিতে পারেন নি।

টেকটাইট প্রস্তর জাতীয় কোন কিছুও নয়, আবার একে পুরোপুরি লৌহজাতীয় পদার্থও যে বলব তাও নয়। তার চেয়ে বরং একে
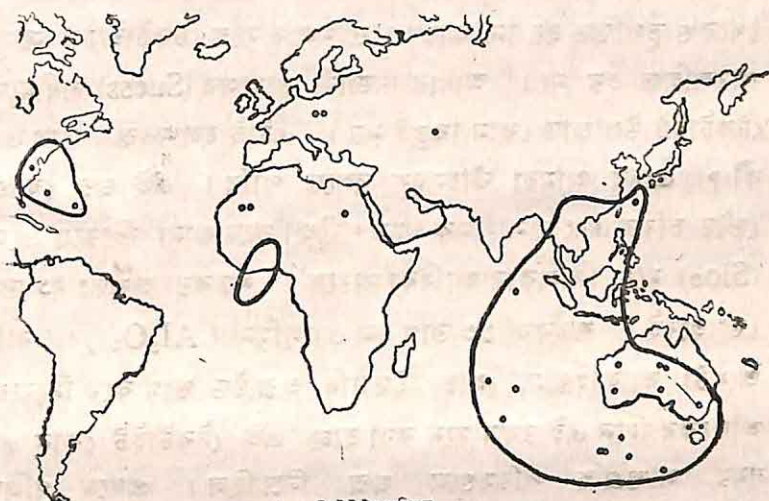
টেকটাইটের প্রাপ্তিস্থান

কাঁচসদৃশ বলা ভাল। ভূস্তরে এরা একদিন প্রোথিত ছিল, খননকার্য চালিয়ে আমাদের হস্তগত হয়েছে। আঁজলা ভরে টেকটাইট হাতে তুলে নিন, নাড়াচাড়া করুন, অবাক হতেই হবে, প্রাকৃতিক কারণেই কোন একদিন এসব তৈরী হয়েছিল, অথচ মনে হবে কোন নিপুণ কারিগর যেন ও গুলোকে তৈরী করে রেখেছে। কুঁচ ফলের কথা মনে করুন, সেই আকারেও টেকটাইট পাবেন, আবার খোলাশুদ্ধ আখরোটের কথাও চিন্তা করুন, কিংবা একটা বড় আকারের চীনে বাদাম, মাঝখানটা একটু ঢেউ খেলে গিয়েছে, তেমন আকারেও পেতে পারেন, কোন কোনটাকে নীলা-গোমেদের মতনও মনে হতে পারে কিংবা হয়তো ভুল হয়েও যাবে শালগ্রামশিলা হাতেতুলে নিই নি তো। দেখতে যদিও অস্বচ্ছ, একটু কালচে রংয়ের, তবু মনে হয় একটু ঘষামাজা করে নিলেই রংয়ের একটা আভা

খেলে যাবে। ফিকে সবুজ রং ধরা পড়তে পারে, অথবা নীলাভ, অথবা মনে হবে বাদামী একটা আভাও যেন ছড়িয়ে পড়ছে।

টেকটাইট পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্ভূত কোন পদার্থ যে নয়, তার কারণ পৃথিবীর যেসব জায়গায় টেকটাইট পাওয়া গিয়েছে তার আশেপাশে কোন আগ্নেয়গিরিকে দেখা যায় নি। এমন কি চাঁদ থেকেও ভূপতিত হয় নি, কারণ চান্দ্রশিলার সঙ্গে টেকটাইটের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। আবার বিজ্ঞানী সুয়েসের (Suess) দাবীমতো টেকটাইট উল্কাজাত কোন কিছুই নয়। এটাই হল রহস্য। তবে এরা কী? এদের আমরা কাঁচসদৃশ বলতে পারি। এই জন্য যে এর ভৌত চরিত্র এবং রাসায়নিক গঠন পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে এদের (SiO_2) মধ্যে সিলিকার আধিক্য রয়েছে। শতকরা অন্ততঃ ৭২ ভাগ তো হবেই। শতকরা ১৩ ভাগ হল এ্যালুমিনা (Al_2O_3)। বাকি অংশটা ক্যালসিয়াম, লোহা ইত্যাদি অক্সাইড ভাগ করে নিয়েছে। আজকের দিনে এই রকম মনে করা হচ্ছে এই টেকটাইট কোন এক সময় আন্তগ্রহ পরিমণ্ডলে জন্ম নিয়েছিল। প্রথমে গলিত অবস্থাতেই ছিল, পরে ঠাণ্ডা হয়, কঠিন ঘনীভূত রূপ নেয়। সেই সময়ে কিছু গ্যাসীয় বুদবুদও এদের মধ্যে থেকে যায়। তারপর কোনও কারণে পৃথিবীতে নেমে আসে।

এই হল সংক্ষেপে টেকটাইটের বর্ণনা। এখন আপনারাই চিন্তা করুন কিছু বিজ্ঞানীর দাবীমতো টেকটাইটের সঙ্গে ধূমকেতুর কোন সংস্রব কি ঘটনো যায়?

এইবার উল্কা এবং এ্যাসটেরয়েডের সঙ্গে ধূমকেতুর কোন সম্পর্ক আছে কি না সেই কথায় আসা যাক। উল্কা দেখার ব্যাপারটা বলতে গেলে আমরা প্রায় সকলেই জানি। মাঝে মাঝেই আমাদের নজরে পড়ে অন্ধকার আকাশের বুক চিরে হঠাৎই একটা উজ্জ্বল আলোক-বিন্দু ছুটে চলে গেল। ভালমতো ঠাহর করতে না করতেই দেখা যায় নিমেষের মধ্যে সেটা মিলিয়েও গেল। সাধারণ মানুষ এতে ভীত-চিন্তিতই হয়ে পড়েন, ভাবতে বসেন এ কী অদ্ভুত ব্যাপার, এমন ঘটনা

তো হওয়া উচিত নয়, এসব অমঙ্গলজাতীয়, আকাশের তারা যে খসে পড়ল। কিন্তু বিজ্ঞান বলে ওসব কিছু নয়, এ হল উল্কা। মহাজাগতিক বস্তুপিণ্ড। সময় সময় পৃথিবীর টানে তীব্র গতিবেগ নিচের দিকে নামতে থাকে। ফলে তাকে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করতেই হয় এবং বাতাসের সঙ্গে প্রবল একটা ঘর্ষণও গড়ে তোলে। তখন এত তাপ উৎপন্ন হয় যে সেই বস্তুপিণ্ড জ্বলে ওঠে। কিন্তু পৃথিবীতে পড়ার সময় তার আর অবশিষ্ট দেহ বলে কিছুই থাকে না। জানা যায় সেই বস্তুপিণ্ড তখন ভস্মে পরিণত হয়েছে।

অবশ্য যারা নিতান্তই বড় আকারের বস্তুপিণ্ড তাদের সব অংশ জ্বলে গিয়ে ক্ষয় হয়ে যায় না। অনেক সময়েই তারা বিরাট বিরাট অংশ নিয়ে পৃথিবীতে আছড়ে পড়ে। প্রচণ্ড সেই আঘাতে ভূপৃষ্ঠে তখন কিছু খানাখোন্দল, ফাটলেরও সৃষ্টি হয়।

কিন্তু উল্কা মহাজাগতিক পরিমণ্ডল থেকে আসেই বা কোথা থেকে, তার আদি-উৎপত্তি সম্বন্ধেই বা আমরা কী বলতে পারি? উল্কা কোথা থেকে আসে এ কথাটা যদিও বা বলা যায়, তার আদি-উৎপত্তিগত যথাযথ কারণ আজও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় নি। ধূমকেতুর ভগ্নাংশকেও আমরা উল্কা বলতে পারি, আবার এ্যাসটেরয়েডের ধ্বংসরূপকেও উল্কা বলা হয়, অথবা উল্কা একদা বর্তমান কোন গ্রহ বা উপগ্রহের বিধ্বস্ত-বিচ্ছিন্ন রূপও হতে পারে, গ্রহদের আগ্নেয়গিরি থেকে নিক্ষিপ্ত পদার্থও হতে পারে, কিংবা কারও কারও মতে সূর্য কিংবা অন্য কোন নক্ষত্র থেকে উৎক্ষিপ্ত বস্তু পরে ঠাণ্ডা হয়ে উল্কা রূপেও থাকতে পারে।

ধূমকেতুর ভেঙ্গে যাওয়া অংশগুলো উল্কাপিণ্ডরূপে পৃথিবীতে ঝরে পড়ার তথ্য প্রথম আমাদের গোচরে এনেছিলেন ইতালীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী শিয়াপারেল্লি (G. V. Schiaparelli)[৩]। তখন ১৮৬২ সাল, আকাশে তিনি একটা ধূমকেতু দেখলেন। খালি চোখেই। তারপর মাঝে কয়েকটা বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু ধূমকেতুটা সামনেই তাঁর মন অধিকার করে রইল। ১৮৬৬ সালে

তাঁর মনে হল পার্সেইড্‌স্‌ (Perseids) নামে উল্কার যে-ঝাঁকটা আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার কক্ষপথের সঙ্গে ধূমকেতুটার কক্ষাকৃতির কেমন যেন একটা মিল তিনি খুঁজে পাচ্ছেন। সন্দেহ হল ধূমকেতুটা ভেঙ্গে গিয়ে উল্কার ওই ঝাঁকটা তৈরী করে নি তো!

পরবর্তী কালে আরও অনেক ধূমকেতুর কক্ষপথের সঙ্গে উল্কা-ঝাঁকের কক্ষাকৃতির সাদৃশ্য ধরা পড়েছে। আমরা একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরলাম।

উল্কার ঝাঁক ধূমকেতুর নাম	কক্ষপথের আনতি	কক্ষপথের উৎকেন্দ্রতা	জ্যোতিষীয় একক দূরত্ব	অনুসূরের দূরত্ব	দিনের হিসেব
Perseids Comet 1868II	১১৬ ১১৪	০.৯৬ .৯৬	২২.৬ ২৪.৭	০.৯৬ .৯৬	১০৮ ১২২
Leonids Comet 1866 I	১৬৩ ১৬০	.৯১ .৯১	১০.৩ ১০.৩	.৯৯ .৯৮	৩৩ ৩৩
Lyrids Comet 1861 I	৮০ ৮০	০.৯৮ ০.৯৮	— ৫৬.	.৯০ .৯২	— ৪১৫
Andromedes Biela Comet	২৪৬ ২৪৬	.৭৫ .৭৬	— ৩.৫২	.৮৬ .৮৬	— ৬.৬
Taurids EnckesComet	৫ ১৩	.৮২ .৮৫	২.২২ ২ ২২	০.৩৯ .৩৩	৩.৩ ৩.৩
Umids Comet tuttbI	৫৪ ৫৫	.৮৪ .৮২	— ৫.৭৩	.৯৪ ১.০২	— ১০.৭

কিন্তু এখানে একটা কথা ভাববার আছে। ধূমকেতু বার বার করে সূর্যকে বেড় দেওয়ার পর যখন ভেঙ্গে যায় তখনও দেখা যায় তাদের সেই চূর্ণ-বিচূর্ণিত অংশগুলো আরও কিছু কাল সূর্য-পরিক্রমা করে চলেছে। এবং ধূমকেতুগুলো তাদের আগেকার যে-আকৃতির কক্ষপথ ধরে সূর্যকে বেড় দিত উল্কার ঝাঁকও সেই সব কক্ষাকৃতির মোটামুটি একটা আদল বজায় রেখেছে। কিন্তু পৃথিবীতে এই সব খণ্ডাংশগুলোকে নেমে আসতে হলে বিশেষ একটা অবস্থার সৃষ্টি হওয়া চাই। পৃথিবীকে এই উল্কাঝাঁকের কাছে আসতে হবে এবং যে-বিন্দুতে উল্কার ঝাঁক এবং পৃথিবীর সঞ্চারপথ ছেদ করবে

সেই পরিস্থিতিতেই কেবল পৃথিবীর টান উল্কাঝাঁকের উপর অনুভূত হবে। তখনই উল্কাখণ্ড পৃথিবীতে নামতে থাকবে।

উল্কাখণ্ডের উপাদানও পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু একাজে কিছু অসুবিধে আছে। কারণ পৃথিবীতে যখন উল্কাপতন হয়
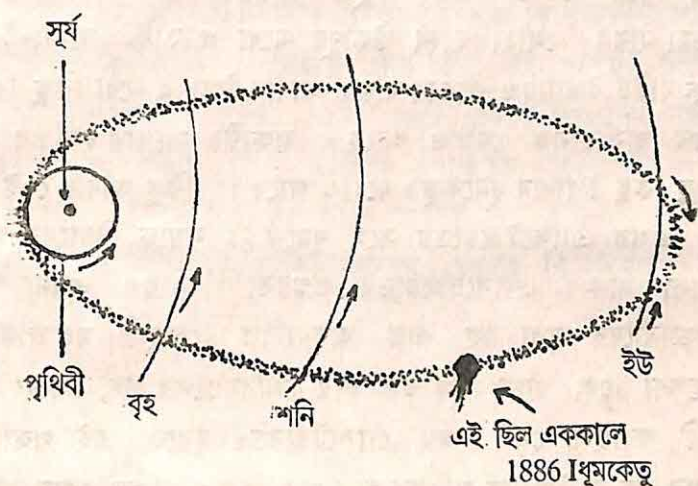
1886 I ধূমকেতু এখন ভগ্ন অবস্থায় উল্কার ঝাঁকে পরিণত হয়েছে

তখন সহজেই অনুমেয় এক পরিবেশ থেকে অন্য আর এক পরিবেশে এরা হাজির হয়। ফলে নিজস্ব কিছু স্বভাবধর্মকে তাদের হারাতে হয়। যাই হক, উল্কার ভৌতচরিত্র সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞান অনুসারে তাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি। এক হল, পাথুরে উল্কা বা stony meteorite। দুই, লৌহজাতীয় উল্কা বা iron meteorite, এবং তিন, লোহা-পাথর মিশ্রিত উল্কা বা stony-iron meteorite। ধূমকেতু ভেঙ্গে যেসব উল্কা পৃথিবীতে পড়ে তারা সাধারণত পাথুরে বা সামান্য লৌহমিশ্রত পাথর-জাতীয় হয়। এই ধরণের উল্কাখণ্ড পরীক্ষা করে ধূমকেতুর উৎপত্তি সংক্রান্ত একটা বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। সৌরমণ্ডল সৃষ্টির সময় সেই সুদূর Oort Cloud অঞ্চলে লোহার মতো ভারী পদার্থের তেমন প্রাচুর্য ছিল না এবং ধূমকেতুর মধ্যেও এই জন্য লৌহজাতীয় উপাদান কম পাওয়া যায়। কিন্তু সূর্যের কাছাকাছি অঞ্চলে,

যেমন, বুধ থেকে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝামাঝি জায়গাটা পর্যন্ত, লৌহজাতীয় পদার্থ একটু বেশীই পাওয়া গিয়েছে। বুধ থেকে মঙ্গলগ্রহ যে-উপাদানে গঠিত তারা যে শুধু এর প্রমাণ দেয় তা নয়, উল্কাপাতের মধ্য দিয়ে এ্যাসটেরয়েডের নমুনা সংগ্রহ করেও এ বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়। লোহা ছাড়া উল্কাণুর মধ্যে গ্রাফাইট ম্যাগনেটাইট, ক্রোমাইট ইত্যাদিও পাওয়া যায়। আবার উল্কাণুর মধ্যে কিছু বিশেষ জৈব রাসায়নিক যোগও আছে। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল এর মধ্যে কিছু কিছু উপাদান ধূমকেতুর মধ্যেও আছে। কিছু আবার নেই।

এবার এ্যাসটেরয়েডের সঙ্গে ধূমকেতুর সম্বন্ধে বিচারের কথায় আসা যাক। এ্যাসটেরয়েডের জন্মবৃত্তান্ত নিয়েও এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহু প্রশ্ন অসমাধিত রয়েছে। মহাজাগতিক বস্তুকণা এবং গ্যাস পুঞ্জীভূত হয়ে সৌরমণ্ডলের গ্রহ, উপগ্রহ যখন সৃষ্টি করছিল, সেই সময় এ্যাসটেরয়েডও হয়তো এই পদ্ধতিতে কোন গ্রহ বা উপগ্রহে পরিণত হতে চেয়েছিল। কিন্তু কোন কারণে একটা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে সেটা আর সম্ভব হয় নি। তারা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। এই ভগ্ন অবস্থাতেই আজ আমরা এ্যাসটেরয়েডদের পেয়ে থাকি। এটা হল প্রচলিত ধারণা। কিন্তু একমাত্র গৃহীত তত্ত্ব নয়। অনেকে আরও কত কথা বলছেন।

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীরা কিন্তু একটা তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। যে-অবস্থায় বর্তমানে এ্যাসটেরয়েড়রা রয়েছে সেই অবস্থা থেকে তারা আরও ভেঙ্গে যাচ্ছে। উল্কা হয়ে ঝরে পড়ছে। সংখ্যায় এরা অজস্র এবং সূর্য-পরিক্রমা করার সময় এরা নাকি পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়েও ফেলেছে এবং তখন ভেঙে যাচ্ছে। আবার অন্যভাবেও এরা চূর্ণ হতে পারে। যেমন, সৌরঝড় যেভাবে শক্তিশালী বিদ্যুৎ এবং চৌম্বকক্ষেত্র তৈরী করে, তাতে এ্যাসটেরয়েড-দের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়ে এত বেশী তাপ এবং আবর্তনের সৃষ্টি করতে পারে যে তখন এরা আরও খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়।

আকারে এরা নানান রকমেরই হতে পারে। ছোটখাট আকারও আছে, মনে হবে যেন এক-একটা পাথরের চ্যাঙ্গাড়। আবার বড় আকারও হতে পারে, ৮০০ থেকে ১০০ কিলোমিটার ব্যাসযুক্ত এ্যাসটেরয়েডও আছে। পাশাপাশি কোন একটা মৃত ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস এবং এ্যাসটেরয়েডকে রাখলে বলা শক্ত কোনটি নিউক্লিয়াস, কোনটি এ্যাসটেরয়েড। উভয়কে মনে হয় শক্ত, অমসৃণ, নিরেট, পাথুরে জ্যোতিষ্কীয় পদার্থ। এত সুন্দর একটা দৃশ্যগ্রাহ্য সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু আকারে ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস ৮০০ থেকে ১০০০ কিলোমিটারের মতন কখনই বড় হয় না। এটাই যা পার্থক্য। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন এখানে বিস্ময়েরও কিছু

উল্কা এবং এ্যাসটেরয়েডের পথ
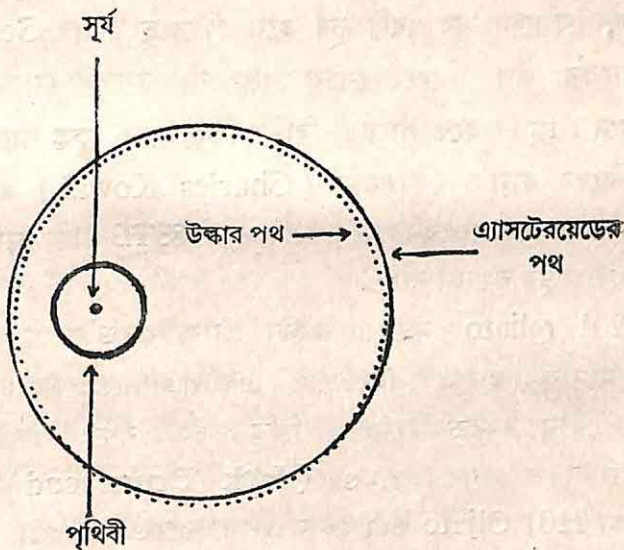
নেই। এ্যাসটেরয়েডের মূল ঝাঁকটা মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যবর্তী এলাকাটা দখল করে আছে। সেখানে তারা তাদের সৃষ্টির উপাদান বেশী পেয়েছে, তাই আকারে বড় হতে পেরেছে। ধূমকেতুগুলো খুবই দূরে আছে। সেখানে মালমশলাও কম ছিল। স্বাভাবিক কারণে তাদের আকারটাও তাই বড় হতে পারে নি।

এমন কিছু ধূমকেতু এবং এ্যাসটেরয়েডও আছে যাদের কক্ষপথের

মধ্যে একটা সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা গিয়েছে। যারা স্বল্পকালীন ধূমকেতু এবং যেসব এ্যাসটেরয়েড বৃহস্পতি থেকে বুধের অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে তাদের ক্ষেত্রেই এই ধরনের প্রায়-সমাকৃতি কক্ষপথ ধরা পড়েছে। মাত্র দু'বছর আগে, ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে, লাইকেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 1983TB নামে একটা এ্যাসটেরয়েডকে খুঁজে পেয়েছিলেন। পৃথিবীর খুবই কাছে এই এ্যাসটেরয়েড চলে আসে। এর কক্ষপথের সঙ্গে Geminid নামে উল্কাঝাঁকের কক্ষপথ অদ্ভুত একটা মিলও তুলে ধরে। এই আবিষ্কারের ফলে অনেক বিজ্ঞানী এই উপসংহারে আসতে চেয়েছেন যে 1983TB নামে এ্যাসটেরয়েডটা আসলে কোন এক ধূমকেতুরই ভগ্নাংশ, যেগুলো খুব বেশী চূর্ণ হয়ে গিয়েছে তারাই Geminid উল্কাঝাঁকের রূপ নিয়েছে, যেটুকু ভাঙ্গে নি তাকে এ্যাসটেরয়েড বলে মনে হচ্ছে। হতে পারে। বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু পালোমোর মানমন্দিরের চার্লস কোওয়াল (Charles Kowal) এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে 1983TB নামে এ্যাসটেয়ড কোন ধূমকেতুর ভগ্নাংশ নয়।

2201 Oljato নামেও একটা এ্যাসটেরয়েড আছে। প্রথম দিকে মনে করা হত এটা নির্ভেজালই একটা এ্যাসটেরয়েড, ধূমকেতুর সঙ্গে কোন সংস্রব নেই। কিন্তু ১৯৮২ সালে এ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যাক ড্রামণ্ড (Jack Drummond) বক্তব্য রাখলেন 2201 Oljato ওটা কোন এ্যাসটেরয়েড নয়, ওটা আসলে একটা মৃত ধূমকেতু। তাঁর অনুমান যে কত দূর অভ্রান্ত এটা পরে প্রমাণিত হল, এবং শুধু তাই নয়, এও জানা গেল ওটা সম্পূর্ণরূপে মৃত ধূমকেতুও নয়। শুক্রগ্রহ অভিমুখে পায়োনিয়ার নামে এক মহাকাশযান পাঠানো হয়েছিল। চলার পথে এই মহাকাশযান Oljato সম্বন্ধে কিছু পরীক্ষা-নিরক্ষার কাজ চালিয়েছিল। আজ জানা যাচ্ছে ওটা সত্যিই একটা ধূমকেতু, কিন্তু মরণোন্মুখ, তার চারপাশে গ্যাসীয় খোলসটা নামমাত্র কোনও রকমে টিঁকে আছে,

তার থেকে যৎসামান্যই পুচ্ছদেশ সৃষ্টি হয়। দেখা যায় না বললেই চলে। এইজন্যই একে এতকাল ধূমকেতুর বদলে একটা এ্যাসটেরয়েড মনে করে বিজ্ঞানীরা ভুল করে এসেছেন।

ধূমকেতু এবং এ্যাসটেরয়েডের মধ্যে এই ধরনের বিভ্রান্তির কিছু উদাহরণ আছে। 944 Hidalgo নামে একটা এ্যাসটেরয়েড আছে। এর ব্যাস ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার এবং সূর্য থেকে এর দূরত্ব হল ২ থেকে ১০ জ্যোতিষীয় একক। এদিকে Schwassmann-Wachmann-I নামেও একটা ধূমকেতু আছে। এর ব্যাসও প্রায় ৪০ কিলোমিটার এবং সূর্য থেকে এর দূরত্ব ৫·৫ থেকে ৫·৭ জ্যোতিষীয় এককের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। অনেকের মতে Hidalgo এ্যাসটেরয়েডই নয়, ওটা ধূমকেতু। গ্যাসীয় অংশ একরকম নিঃশোষিত হয়ে গিয়েছে। শুধু কেন্দ্রীয় অংশটাই এখনও পর্যন্ত অটুট আছে।

কিন্তু Chironকে আমরা কী বলব। এ্যাসটেরয়েড, না ধূমকেতু? ৩০০ থেকে ৪০০ কিলোমিটারের মতন হল এর ব্যাস। এ ধরনের ইব্যাসযুক্ত অনেক এ্যাসটেরয়েডই আছে, কিন্তু এত বড় আকারের নিউক্লিয়াসযুক্ত ধূমকেতু আছে বলে এখনও পর্যন্ত জানা যায় নি। সেক্ষেত্রে একে যে তাহলে ধূমকেতু না বলে এ্যাসটেরয়েড হিসেবে গণ্য করব সেখানেও একটু সমস্যা আছে। Chiron-এর কক্ষপথের আকৃতি স্থির থাকে না, মাঝে মাঝেই সেই কক্ষপথ আকৃতিতে একটু-আধটু বদলে যায়। ধূমকেতুর ক্ষেত্রেই এই ধরনের কাণ্ডকারখানা হয়ে থাকে, তাদের কক্ষপথ প্রায়ই বদলে যায়। কিন্তু এ্যাসটেরয়েডের কক্ষপথ সাধারণত অবিকৃত থাকে। তাহলে এটা কী? বিজ্ঞানী কোওয়ালের মত হল একটা মিনি প্ল্যানেট। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

পাদটীকা

১. এ্যাসটেরয়েডের বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে গ্রহাণু। এই কথা খুবই চালু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যথার্থে এ্যাসটেরয়েডকে গ্রহাণু

বলা অনুচিত। কেন, এই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ আছে। বর্তমান লেখকের মতে asteroid-কে বাংলায় এ্যাসটেরয়েডকে বলাই শ্রেয়। সব সময়েই যে পরিভাষার সৃষ্টি করতে হবে এমন কোন কথা নেই। Tektite-এর বাংলা কী? সেখানে তো 'টেকটাইট' কথাটাই চলছে। আপাতত বলা ভাল গ্রহাণু কথাটা asteroid-এর অর্থবহ নয়।

২. লিক মানমন্দিরের বিজ্ঞানী চেম্বারলিন, হাওয়ার্ড ইত্যাদি।

৩ মঙ্গলে বুদ্ধিমান জীব আছে বা একদা তাদের অস্তিত্ব ছিল, তারা সেখানে canali বা খাল খনন করে রেখেছে, শিয়াপারেল্লির এই দাবী পৃথিবীতে এক সময় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তাঁর এই দাবী আজ পরিত্যক্ত হয়েছে।

২৩

ধূমকেতু সখের পর্যবেক্ষণ

ধূমকেতু নিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ হয়ে এল।

ইতিমধ্যে, অনুমতি প্রার্থনা করি, আপনাদের সঙ্গে কিছু অন্তরঙ্গ আলাপন করে নিতে ইচ্ছে করি।

বলুন তো, আপনাদের কারও কখন কি অজানা কোন ধূমকেতু আবিষ্কারের ইচ্ছে হয়? কথাটা শুনেই হয়তো চমকে উঠছেন, ভাবছেন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোন রসিকতা আছে। আদপেই নয়। অনুরোধ করছি, ভুলে যাবেন না কত সাধারণ মানুষ, প্রথাগতভাবে বিজ্ঞানে যাঁরা কোন দিনই দীক্ষিত ছিলেন না, তাঁরা ধূমকেতু আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, তাঁদের আজও আমাদের বার বার করে স্মরণ করতে হয়। বিজ্ঞানের জ্ঞানের চেয়েও বিজ্ঞানে এঁদের অফুরন্ত আগ্রহ এবং কৌতূহল ছিল। বিজ্ঞানকে এঁরা ভালবেসেছিলেন। এই ছিল এঁদের পুঁজি! এই নিয়েই এঁরা কাজে নেমে পড়েছিলেন।

তাই বলছিলাম নতুন কোন ধূমকেতু আবিষ্কার করা যদি সম্ভবপর হয় সে তো ভালই, তা যদি নাও হয় নিদেনপক্ষে পুরনো সেসব ধূমকেতু মাঝে মাঝে আমাদের আকাশে যারা জাঁকিয়ে বসে তাদের পর্যবেক্ষণের কাজেও অন্তত লেগে যান। সত্যি কথা বলতে কি ধূমকেতু দেখার মধ্যে একটা রোমাঞ্চ, শিহরণ আছে। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমাদের হাতে এসে যায়। হয়তো অনুযোগ করবেন ভালভাবে ধূমকেতু দেখার কাজে যন্ত্রসম্ভার কই, কাজটা ঠিকমতো এগোবে কী করে? প্রাথমিক তথ্যের জন্য বইপত্র কি সহজলভ্য? কথাগুলো একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তবু বলি কাজে নামুন, একজনে না হয় দু-তিনজন মিলেও কাজে নেমে পড়ুন। আগে

উদ্যোগের নেশাটা আপনাকে আঁকড়ে ধরুক, তারপর দেখবেন কীভাবে সব বাধাবিপত্তি সহজ করে কাজ করার পথনির্দেশ করা যায় সেটা আপনি নিজেই স্থির করতে পারছেন। প্রথম দিকে হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন বিফলে যাবে, কত ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে, কোথায় ধূমকেতু কোথায় কী? কিন্তু যাঁরা ধূমকেতু দেখার কাজে নামেন তাঁদের কেউই এই ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে মুক্ত নন।

যাইহোক, ধূমকেতু দেখার কাজে আমাদের কিছু প্রস্তুতি দরকার। তা না হলে আমাদের সমস্ত প্রয়াসই এলোমেলো হয়ে গিয়ে অবশেষে ভেস্তে যাবে। সেগুলোই এখন লিপিবদ্ধ করি।

(১) আপনাকে জানতে হবে ধূমকেতু আপনি কখন দেখবেন। সময়টা কী? আকাশের অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের দেখার কোন ঝামেলা নেই। রাতের বেলা যে কোনও সময় তাদের দেখা চলে। ধূমকেতুর ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটবে না। দুটো সময় বেছে নিতে হবে। রাতের নিরবিচ্ছিন্ন সুখনিদ্রার আশা করলে চলবে না। প্রথম প্রহরগুলোয় বরঞ্চ আরাম করে একটু ঘুমিয়ে নিন, মাঝ রাত থেকেই তৈরী হতে হবে, কাজ চলবে একেবারে সূর্য-ওঠা পর্যন্ত। এদিকে বেলা যখন গড়িয়ে আসবে, সূর্য যখন পাটে বসবে, আপনার আর পাঁচটা কাজ-কর্মেও আপনি ইতি করে দিন। আর একবার আপনার ধূমকেতু-পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করতে হবে। সাঁঝরাতের আলোআঁধারির মধ্যে যতক্ষণ সুযোগ পান ধূমকেতু দেখার কাজ চালিয়ে যান।

(২) ধূমকেতু দেখার কাজে এও জেনে নিন কোন্ পক্ষ তখন চলছে। শুক্লপক্ষ না কৃষ্ণপক্ষ। যদি শুক্লপক্ষ হয় আপনাকে একটু বাড়তি সতর্কতা নিতে হবে, তড়িঘড়ি কাজ সারতে হবে। শশীকলা দিনে দিনেই আকারে বাড়বে, তারপর একদিন আকাশে জোছনার হাট বসিয়ে দেবে। ধূমকেতু দেখার কাজ তখন খানিকটা পণ্ড হতে বাধ্য। কৃষ্ণপক্ষ হলে অবশ্য এ সমস্যায় ভুগতে হয় না।

(৩) পৃথিবী থেকেই আমাদের ধূমকেতু দেখার কাজ সারতে হবে। অতএব পৃথিবী, সূর্য এবং ধূমকেতু—এই তিনের পারস্পরিক

অবস্থান আমাদের একটু জেনে নিতে হবে। এরা পরস্পর কার থেকে কে কতটা কাছে-দূরে আছে এটা জানা থাকলে ধূমকেতুকে ভালমন্দ দেখার ব্যাপারটায় পরিষ্কার একটা জ্ঞান গড়ে নেওয়া যায়।

(৪) পর্যবেক্ষক হিসেবে আপনি পৃথিবীর কোন্ অক্ষাংশ থেকে ধূমকেতু দেখছেন সেটাও জেনে রাখুন।

(৫) আকাশপটেই আমাদের ধুমকেতু দেখার কাজ চলবে। গ্রহ-নক্ষত্র ছাড়া আকাশে নীহারিকা আছে, নক্ষত্রপুঞ্জ আছে, ছায়াপথকেও সেখানে দেখা যায়, খণ্ড খণ্ড পেঁজা তুলের মতোও সেখানে মেঘ ভেসে বেড়ায়। ধূমকেতুটার ভালোমত পুচ্ছদেশ সৃষ্টি হওয়ার আগেই তাকে আপনাকে আকাশে দেখে নিতে হবে। তবেই না আপনার আনন্দ এবং বাহাদুরিও বটে। লেজ গজানোর অবস্থায় তাকে তো আমরা সকলেই দেখব। সে দেখারও মূল্য আছে। ভালও লাগে, জানারও অনেক কিছু থাকে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় দেখার গুরুত্ব অশেষ। প্রথম দর্শনে ধূমকেতুকে মনে হবে আকাশের গায়ে শুধুই সামান্য ছোপ। কিন্তু সেটাই যে ধূমকেতু নির্ণয় করতে পারবেন তো? নীহারিকা, নক্ষত্রপুঞ্জ বা সাধারণ মেঘখণ্ডের সঙ্গে ধূমকেতুটা একাকার হয়ে যাচ্ছে না তো?

তাহলে বলি আকাশের নক্ষত্রদেরও এই ফাঁকে একটু চিনে নিন। ভাবছেন এটা আবার উটকো খাটুনি। তা কেন হবে? এটা হবে আপনার উপরি লাভ। খুঁটিয়ে নক্ষত্র বা নক্ষত্রমণ্ডল দেখার কথা কিন্তু বলছি না। অতশত করার দরকার নেই। কোন্ ঋতুতে মোটামুটি কোন্ কোন্ নক্ষত্র এবং নক্ষত্রমণ্ডল আকাশে বহাল থাকে সেটা জানা থাকলেই কাজ চলে যাবে। কেন না যখন নতুন কোন ধূমকেতু আপনি আবিষ্কার করবেন বা পুরনো কোন ধূমকেতুও আকাশে দেখবেন তখন আপনাকে বলে দিতে হবে কোন্ নক্ষত্রপটে তাকে দেখেছেন, তখন সময়ই বা কী ছিল এবং আকাশের কত ডিগ্রীই বা উপরে।

যদি কোন নক্ষত্রমণ্ডলের নাম এবং আকৃতি আপনার মনে গেঁথে

বসে থাকে, তাহলে তার কাছে ছোট্ট কোন নক্ষত্রপুঞ্জ বা নীহারিকা, এমন কি ছায়াপথের অংশবিশেষও আছে কি না, সেটা আপনি তৎক্ষণাৎ বলে দিতে পারবেন। এদের কাছে যখন ধূমকেতু আবির্ভূত হবে তখন এদের সঙ্গে ধূমকেতুকে এক করে ফেলার কোন সম্ভাবনাই আর থাকবে না। প্রথম বারে ধূমকেতুকে যদিও বা মেঘখণ্ড মনে করে বসেন, দ্বিতীয় দিনে দেখবেন আর সে বিভ্রান্তি হচ্ছে না। কারণ মেঘকে কখনই একই আকারে এবং আকাশের একই জায়গায় দেখা যায় না।

কিন্তু ভালোভাবে ধূমকেতু দেখতে হলে শহরের কথা আপনাকে ভুলে যেতে হবে। একটু দূর গাঁ-গঞ্জেই চলে যাওয়া ভাল। সেখানকার আকাশ অনেক পরিষ্কার, শহরের মতন এত ধূলো, ধোঁয়া, কৃত্রিম আলোর প্রতিফলনে বিবর্ণ নয়।

(৬) ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের কাজে হাতের কাছে একটা Comet Ephimery রেখেছেন তো? এটা থাকলে আপনার কাজের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা থাকবে। চেষ্টা করে দেখুনই না, এক খণ্ড যোগাড় করা মনে হয় খুব অসম্ভবের ব্যাপার হবে না। ঠিকানা দিলাম দেখুন। এই ধরণের ধূমকেতু সম্বন্ধে বিশেষ ধরনের পঞ্জিকাতে পুরনো ধূমকেতুর কক্ষপথের আকৃতি, তার আনতি, অনুসূর থেকে তার দূরত্ব, দীপ্তি ইত্যাদির কিছু উল্লেখ থাকে। আনকোরা নতুন কোন ধূমকেতু আকাশে উঠলে ধূমকেতু-পঞ্জিকাতে প্রাপ্ত পুরনো ধূমকেতুদের তালিকা মিলিয়ে তখন কাজ করতে সহজ হয়।

(৭) আপনার পর্যবেক্ষণের সময় এও লক্ষ্য করুন সাদা ছোপটা নক্ষত্রদের সাপেক্ষে একটু একটু করে তার স্থান পরিবর্তন করছে কি না, দীপ্তিতেও বাড়ছে কি না। যদি তাই হয় তাহলে নিঃশর্তে ধরে নিতে পারেন ওটা নক্ষত্রপুঞ্জ নয়, নীহারিকা নয়, আর মেঘখণ্ড তো নয়ই, যার জন্য ধৈর্য ধরে এত অধ্যবসায় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন এ হল আপনার আকাঙ্ক্ষিত সেই ধূমকেতু। সব দিক বিবেচনা করে এখন চিন্তা করুন ধূমকেতুটা নতুন, না পুরনো যদি নতুন

ধূমকেতুই আবিষ্কার করেছেন বলে মনে করেন সেক্ষেত্রে আপনার দাবীটা সর্বজনগ্রাহ্যও তো হওয়া চাই, কিন্তু সে দাবীকে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন সেটাও কি ভেবে দেখেছেন ?

International Astronomical Union, Cambridge, Massachusetts, USA, অথবা Comet Section, British Astronomical Association, Burlington House, Picadilly, London W IV ONL-কে সত্বর জানিয়ে দিন। ওঁদের ওখানে রীতিমতো দপ্তর আছে, ধূমকেতু সম্বন্ধে অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন। ওঁরা পরীক্ষা করে দেখবেন আপনার দাবী কতটা ঠিক। যদি প্রমাণিত হয় ধূমকেতুটার প্রথম আবির্ভাব হচ্ছে, তাহলে আবিষ্কারক হিসেবে আপনার নামেই ধূমকেতুটার নাম রাখা হবে, আপনার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বেই।

কিন্তু কখনও যেন পত্রব্যবহার করবেন না, অযথা বিলম্ব হয়ে যাবে। আরও অনেকেই তো আকাশে শ্যেনদৃষ্টি মেলে বসে থাকেন, কে জানে অন্য কেউ যদি আপনার আবিষ্কারের দাবীদার হয়ে বাজার মাৎ করে বসেন ? অতএব তারবার্তা পাঠান। কিন্তু বয়ান কেমন হবে জানেন তো ? বিজ্ঞানীরা তাঁদের নিজেদের জন্য অনেকটাই যেন সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করেন। সেটার নমুনাও দিচ্ছি, কিন্তু আমাদের জন্য সাধারণ ভাষা ব্যবহার করলেই চলবে। যেমন,

(ক) Comet, eleventh magnitude, discovered by Abhijit Mukherjee, October 4, 1986, at 18 h 49 m Greenwich civil Time, comet's declination 25°13′01″, moving east I m 53 s, north O° 56′.

(খ) Comet Mukherjee O4 (1986) oct. 18490 25°13′01″ (d) to east 1 m 53s N.°56 each day.

আজ হল যন্ত্রযুগ। যন্ত্রের প্রয়োগে আকাশ দেখার আজকাল খুব রেওয়াজ হয়েছে। আমাদের দেশেও কিছু প্রতিষ্ঠানে এই

জিনিস চালু হয়েছে, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে এর প্রচলন দরকার। সেটা এখনও হয় নি। নানা কারণ রয়েছে। উদ্যম-উদ্যোগের যেমন অভাব রয়েছে, আমাদের অর্থসঙ্গতিও বড় কম। তবু মনে হয় যে-কাজ একজনে পারি না, কয়েকজনের মিলিত প্রয়াসে সেটা হয়তো সম্ভবপর।

ধূমকেতু অনুসন্ধানের কাজে যদি কোন ছোটখাট দূরবীন, এমন কি বাইনোকুলারও যোগাড় করতে পারেন তাহলে জানবেন সোনায় সোহাগা, আপনাকে তখন পায় কে, দেখবেন কাজ কত সুষ্ঠুভাবে তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে। অত্যাধুনিক শক্তিশালী দূরবীনের কথা বলছি না। এই ধরনের দূরবীন আমাদের হাতের নাগালের বাইরে। কিন্তু সাধারণ শক্তির দূরবীন দিয়েও বহু ধূমকেতু আবিষ্কৃত হওয়ার ঘটনা আছে। ১৬৮০ সাল, আজ থেকে তিনশো বছর আগেকার কথা, তখনকার দিনে দূরবীনের বিবর্ধনশক্তি এমনই বা কী ছিল, অথচ Kirch নামে বিজ্ঞানে আগ্রহী এক ব্যক্তি প্রথম দূরবীন ব্যবহার করে একটা ধূমকেতু আবিষ্কার করেছিলেন। ২″ থেকে ৮″ লেন্সের ব্যাসযুক্ত দূরবীন দিয়েই আপনার কাজ চলে যাবে। ছোট দূরবীন বা বাইনোকুলারের একটা সুবিধে হল তাকে দিয়ে আকাশময় চতুর্দিকে দৃষ্টি রেখে দাপাদাপি করে বেড়ানো যায়। তাতে কোথাও এক কোণেও যদি নিষ্প্রভ কোন ধূমকেতু আবির্ভূত হয় তাহলেও তাকে সনাক্তকরণ করা যায়। ৭×৫০, ১০×৫০ এবং ১০×৮০ ধরনের বাইনোকুলার ব্যবহার করতে পারেন। ৭×৫০* ধরণের বাইনোকুলারগুলো একটু সহজলভ্য। ৭×৫০ ধরনের বাইনোকুলার এবং short-focal length reflector (f4—f5) অথবা refractor (f8—f10) ধরনের দূরবীনের বিবর্ধনশক্তি মোটামুটি প্রায় একই ধরনের। যদি ধূমকেতুর আলোকচিত্র গ্রহণ করবেন স্থির করে থাকেন তো 35 mm SLR ক্যামেরা ব্যবহার করতে পারেন। এতে থাকবে ১·২ অথবা ১·৭-এর f / মাত্রাযুক্ত 50 mm লেন্স, 800 ASA

* ৭ হল বিবর্ধনশক্তি আর ৫০ হল কত মিলিমিটারের aperture।

দ্রুত সাদা এবং কাল ফিলম। আর যদি রঙীন ছবি তুলতে চান তাহলে Kodak 5843, (kodacolor) 250 ASA এবং Orwo/Agfa 100 ASA ব্যবহার করুন। আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ প্রথম শুরু হয়েছিল ১৮৮২ সালে।

এটা ঠিকই যে ধূমকেতু নিত্যদৃশ্য জ্যোতিষ্ক নয়। তাই বলে ধূমকেতুকে ডুমুরের ফুলও ভাববেন না। ওটা সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণা। চেষ্টাচরিত্র চালিয়ে গেলে প্রতি বছর গড়ে ৬টা থেকে ৮টা ধূমকেতু দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ১৯৪৭ সালটা ছিল বিশেষ ব্যতিক্রমের বছর। নতুন-পুরনো মিলিয়ে ১৪টা ধূমকেতু এই বছরে দেখা গিয়েছিল।

এইভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে পেশাদার বিশেষজ্ঞ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং সখের পর্যবেক্ষরা ধূমকেতু অনুসন্ধানের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করে দেন। কখনও এঁরা এককভাবে দেখার কাজ করে যান, কখনও বা দল গঠন করেন, ধূমকেতু সমিতি গড়ে তোলেন। ভাবলে অনুপ্রাণিত হতে হয় মাত্র ১৬ বছর বয়স, আমেরিকার এক স্কুলের ছাত্র, Mark A. Whitaker, ১৯৬৮ সালে ১০ সেন্টিমিটার প্রতিফলক (×৪৫) দূরবীনের সাহায্যে একটা ধূমকেতু আবিষ্কার করেছিলেন। আবার জাপানের এক অল্পবয়স্ক তরুণ, Kaoru Ikeya, কী অসহ্য সাংসারিক দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতেন, বাবার ব্যবসাপাতি নষ্ট হয়ে গেল, মনের জ্বালায় তিনি মদ্যপান ধরলেন, সংসার চালানোর জন্য মাকেও হোটেল-পরিচারিকার কাজ নিতে হল, Ikeya-কেও এক পিয়ানো কারখানায় সামান্য একটা কাজ যোগাড় করে নিয়ে দিন গুজরাণ করতে হল, কিন্তু কী অদম্য উৎসাহ, কৌতূহল আর জ্ঞানের পিপাসা, সেই Ikeya-র নাম কালক্রমে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে ছড়িয়ে পড়ল, তিনি একাধিক ধূমকেতুর আবিষ্কারক হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন।

এ জিনিস কি আমাদের দেশেও হতে পারে না? আপনারা পথ দেখান।